সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

গ্রন্থ পরিচিতি

আলোচ্য পুস্তকখানি বর্তমান বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট চিন্তানায়ক হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (র) এখন থেকে ৫০ বছর আগের মাত্র ২২ বছর বয়সে লেখা। এর রচনাকাল ১৯২৫ সালের জুলাই ও আগষ্ট মাস। মাওলানা সাহেব তখন দিল্লী থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল-জমিয়তের একমাত্র দায়িত্বশীল সম্পাদক। তার আগে তিনি ১৯২০ সালে জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত 'তাজ' পত্রিকায় এবং ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'মুসলিম' পত্রিকায় তরুণ সাংবাদিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আলোচ্য পুস্তকখানি আল-জমিয়তের ১৯২৫ সালের জুলাই মাসের ১৮, ২২, ২৬ ও ২৯ তারিখে এবং আগষ্টের ১০, ১৪ ও ১৮ তারিখের সংখ্যাগুলোতে 'ইসলামের শক্তির উৎস' শিরোনামে ধারাবাহিক সম্পাদকীয় নিবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়। ৪৪ বছর পর্যন্ত আল-জমিয়তের পাতায় অবরুদ্ধ থাকার পর ১৯৬৯ সালে মূল রচনাটি সর্বপ্রথম একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুস্তক সেই প্রকাশনারই ভাষান্তর।

এ যাবত "আল-জিহাদ ফিল ইসলাম" (প্রকাশকাল–১৯২৭) মাওলানা মওদূদীর প্রথম গ্রন্থরূপে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু এখন আশা করা যায় যে, "ইসলামের শক্তির উৎস"ই রচনাকালের বিচারে (প্রকাশকালের বিচারে না হলেও) তাঁর প্রথম পুস্তকরূপে গণ্য হবে। পাঠকদের জন্য এটা পরম কৌতুহলের ব্যাপার যে, উভয় গ্রন্থই তৎকালীন ভারতবর্ষের একটি অতি উত্তেজনাকর ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা শুদ্ধি আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পরিচালিত এ আন্দোলনের দরুন তৎকালে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল এবং কিভাবে ঐ আন্দোলনের মোকাবিলা করা যাবে তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা চলছিল। আর তারই জবাব হিসাবে এ রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। আর 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' লিখিত হয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের পর—যখন হিন্দুদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ধর্মকে নর হত্যার প্রেরণা দানকারী রূপে অভিযুক্ত করার প্রবণতা দেখা দেয়। ঐ গ্রন্থে মাওলানা সাহেব ইসলামের জিহাদ নীতির বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের প্রতি আরোপিত অপবাদ প্রক্ষালনের অত্যন্ত চমৎকার ও সফল প্রয়াস পান।

"ইসলামের শক্তির উৎস" গ্রন্থখানির লেখকের একটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে পাঠকদের নজরে পড়বে। সেটি হলো, লেখকের অপূর্ব চিন্তাগত সাদৃশ্য। অর্ধ শতাব্দী আগে লেখা এ রচনাখানি পরবর্তী সকল রচনার সাথে মিলিয়ে পড়লে এসবের মধ্যে চিন্তার ঐক্য এক অত্যুজ্জ্বল সরল রেখা হয়ে দেখা দেবে। বস্তুতঃ চিন্তার দিক থেকে এমন সুসংহত ও সুসামঞ্জস্য ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়কদের মধ্যেও খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। চিন্তার এ সামঞ্জস্যের প্রমাণ হিসাবে আমরা গ্রন্থকারের ১৯৬৭ সালে প্রদত্ত একটি ভাষণের অংশবিশেষ এ পুস্তিকার শেষে উদ্বৃত করলাম। আমরা আশা করি, আলোচ্য গ্রন্থখানি ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর এর দ্বারা ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট উপকৃত হবেন। সেই সাথে গ্রন্থকারের চিন্তাগত ও মানসিক বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে উপলব্ধি করার ব্যাপারেও এ পুস্তক একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে সহায়ক হবে।

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১

মুসলিম জাতির প্রচার ধর্মী চরিত্র

কিছু কিছু নও-মুসলিম জাতির মধ্যে যখন থেকে ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তখন থেকে ভারত বর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চারিদিক থেকে ইসলাম প্রচারের রব উঠতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সংগঠন আপন আপন সামর্থ অনুযায়ী সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেছেন। পত্র-পত্রিকায় এ কাজের গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা- পর্যালোচনা চলছে। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য আমাদের কি কি উপায়- উপকরণ ও সুযোগ-সামর্থ আছে, তার পর্যালোচনার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মোটকথা, অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকারভাবে ইসলাম প্রচারের একটা সাড়া পড়ে গেছে এবং একটা জাগরণ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে আমরা অনুভব করি যে, আমরা যারা এ যুগে মুসলিম বলে পরিচিত, তারা অতীতের মুসলমানদের সেই তবলিগী প্রেরণা ও উদ্দীপনা সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিফহাল নই, যা এক সময়ে ইসলামের সর্বব্যাপী বিজয়, তার বিশ্বজোড়া কর্তৃত্ব ও পরাক্রমের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ছিল। আজ যদি আমাদের মধ্যে সেই প্রেরণা ও উদ্দীপনা বর্তমান থাকতো তাহলে হয়তো এ সভা-সমিতির প্রয়োজনই দেখা দিতো না। ইসলামের শত্রুদের শত্রুতামূলক আচরণের দরুন আমাদের কপালে করাঘাত করার দরকার হতো না, বরং আমাদের ক্রমবর্ধনমান শক্তি দেখেই শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়তো। সময়ে সময়ে আমরা ভেবে বিস্মিত হই যে, এ অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য এমন এক ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, যে ধর্মের সাংগঠনিক উপাদানগুলোর মধ্যে একটা অপরিহার্য উপাদান ছিল সত্য ও ন্যায়ের দিকে আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রচার। এটা সেই ধর্ম যার আহ্বায়ক গোটা জীবন আল্লাহর সর্বশেষ বাণীকে তার বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজে ব্যয় করেছিলেন এবং যাঁর অনুসারীরা এক শতাব্দীর

মধ্যেই আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে ভূ-মধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত সত্য দ্বীনের প্রচারের কাজ সম্পন্ন করে ছিলেন। প্রশ্ন জাগে যে, আমরা কি তবে সেই সত্য দ্বীনেরই অনুসরণ করছি, না আমরা মুসলমানরাও বনী ইসরাঈলের মত আপন নবীর ইন্তেকালের পর নতুন কোনো ধর্ম বানিয়ে নিলাম ?

আজ আমাদের মুখ ইসলাম প্রচারের সংকল্পে সোচ্চার। আমরা ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দল বা সংগঠন তৈরী করতে চাচ্ছি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এটাই সম্ভবত প্রথম ঘটনা যে, এর অনুসারীরা খৃষ্টানদের ন্যায় মিনারী সমিতি বানাতে সচেষ্ট হয়েছে কিংবা এতটা বেসামালভাবে ইসলাম প্রচারের রব তুলেছে। সমিতি বানানো বা হৈ-হুল্লা করাতেই যদি সাফল্যের প্রকৃত চাবিকাঠি নিহিত থাকতো তাহলে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের চেয়ে আমাদের বেশী উন্নতি করার কথা ছিল। কিন্তু এর বিপরীত অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এত প্রস্তুতি সত্ত্বেও আমাদের পা পেছন দিকে ধাবিত হচ্ছে অথচ আমাদের পূর্ববর্তীরা উপায়-উপকরণ ও প্রস্তুতির চরম অভাব থাকা সত্ত্বেও এতখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে, সেই সাফল্যের দরুনই আজ পৃথিবীর প্রতিটি কোণে ইসলামের অনুসারী বর্তমান। খোদ ভারতবর্ষে আমাদের সংখ্যা ৭ কোটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।[১] এমতাবস্থায় আমাদের ভাবতে হবে, আমাদের আসল অভাব কিসের ? ইসলাম প্রচারের মূল রহস্যটি কি ?

বস্তুত আজ মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো দুর্বলতা দেখা দিয়েছে সেসবই শুধুমাত্র এজন্য দেখা দিয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকে ইসলামের প্রাণশক্তি বেরিয়ে গেছে। মুসলমান হিসাবে তাঁরা কি মর্যাদার অধিকারী সে কথা তাঁরা ভুলে গেছে। তাঁরা যদি ইসলামকে ভাল করে উপলব্ধি করে এবং একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি তা যদি তাঁরা জেনে নিতে পারে তাহলে ইসলাম প্রচারের সমস্যা আপনা আপনিই সমাধান হয়ে যাবে।

মুসলমানদের জীবনের উদ্দেশ্য

অধ্যাপক মাক্স মুলার (Mex Muller)-এর অভিমত এই যে, ইসলাম মূলতঃ একটি প্রচারমূলক ধর্ম। তাবলীগ বা প্রচারের উপরই এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রচারের বলেই তার অগ্রগতি ও বিকাশ সাধিত হয়েছে এবং প্রচারের উপরই তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। বস্তুত ইসলামের শিক্ষা ও উপদেশাবলী অনুশীলন করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম মানেই

১. এটা ১৯২৫ সালের কথা। বর্তমানে উপমহাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি।–অনুবাদক

সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো এবং মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা ছাড়া আর কিছু নয়। পবিত্র কুরআনে মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط -(ال عمران : ١١٠)

"তোমাদের দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম জাতি করে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দান কর ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।"−(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

পৃথিবীর জন্য মুসলমানের অস্তিত্বের প্রয়োজন শুধু এটুকু যে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি গোষ্ঠী তৈরী হওয়া চাই যারা কেবল কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে।"−(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

মুসলমানকে বারংবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -(النحل : ١٢٥)

"তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাও কুশলতা ও সদুপদেশ সহকারে।"−(সূরা আন নাহল ঃ ১২৫)

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ○ (ق : ٤٥)

"কুরআনের সাহায্যে সেই ব্যক্তিকে উদ্দীপিত কর যে আমার হুশিয়ারীতে ভীত হয়।"−(সূরা ক্বাফ ঃ ৪৫)

فَذَكِّرْ قف اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ○ (الغاشية : ٢١)

"আপনি উদ্দীপিত করুন। উদ্দীপিত করা ছাড়া আপনার আর কোনো দায়িত্ব নেই।"−(সূরা আল গাশিয়া ঃ ২১)

এসব শিক্ষার প্রভাব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে সবচেয়ে প্রবল ছিল এবং এ শিক্ষাই সাহাবায়ে কেরামের জীবনে সর্বাত্মক বিপ্লব এনেছিল। তাঁদের পবিত্র জীবন ছিল কেবল দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সদা নিয়োজিত। তাদের উঠাবসা, চলাফেরা—প্রতিটি কাজেরই মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে চালিত করা।

মুসলমানদের জীবনে যতদিন পবিত্র কুরআন ও রসূলের আদর্শের এ শিক্ষাগুলোর প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল ততদিন প্রতিটি মুসলমান ছিল একজন প্রচারক ও মুবাল্লিগ।

তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা, কৃষি, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজই করেছেন। কিন্তু তাঁদের মনে সবসময় এ প্রেরণা ও চেতনা সক্রিয় থাকে যে, ইসলামের আকারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে মহান নেয়ামত ও অমূল্য সম্পদ তাদেরকে দিয়েছেন তা সমগ্র মানবজাতির নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। তাঁরা সত্যিকারভাবে ইসলামকে বিশ্ববাসীর জন্য সবচেয়ে উপাদেয় ও উত্তম নেয়ামত মনে করতেন। আর এ নেয়ামত প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছানোকে তাঁরা তাঁদের ঈমানী দায়িত্বের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতেন। তাই যে ব্যক্তি যখন যে অবস্থায় থাকতো সে সেই অবস্থাতেই এ দায়িত্ব পালন করতো। সওদাগর ও ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ী কাজকর্ম ও লেনদেনের সময়, পর্যটকরা তাদের পর্যটনের ভেতর দিয়ে, কয়েদীরা জেলখানার অভ্যন্তরে, চাকুরেরা অফিসে এবং কৃষকরা খেত-খামারে বসেই এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করতো। প্রচার ও তাবলীগের এ প্রেরণা এতটা চরমে পৌঁছেছিল যে, মহিলারা পর্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে ইসলাম প্রচার করেছেন।

ইসলামের শক্তির আসল উৎস

প্রকৃতপক্ষে এ প্রচারোদ্দীপনাই ছিল ইসলামের শক্তির মূল উৎস। আজ যে পৃথিবীতে ৪০ কোটি (এটাও ১৯২৫ সালের অনুমান। বর্তমানে এর দ্বিগুণ ধরে নেয়া যেতে পারে–অনুবাদক) মুসলমান আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বর্ণ, বংশ ও দেশে যে ইসলামের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বিদ্যমান, সেটা মুসলিম জাতির এ প্রচার ধর্মী চরিত্রেরই ফল।

ইসলামের শত্রুরা বলে থাকে যে, ইসলাম শুধু তরবারীর সাহায্যে ছড়িয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলাম কেবল তাবলীগ বা প্রচারের সাহায্যে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলামের আবির্ভাব যদি কেবল তরবারীর সাহায্যে হতো তাহলে তরবারীর আঘাতেই তা এতদিন শেষ হয়ে যেত। এ যাবত তরবারীর যত আক্রমণ তার ওপর পরিচালিত হয়েছে, তা ইসলামকে ধ্বংস করতে সক্ষম হতো। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে তরবারীর বলপ্রয়োগ করে পরাজিত হয়ে পুনরায় প্রচারের অস্ত্র প্রয়োগ করে বিজয়ী হয়েছে। বাগদাদে যখন মুসলমানদের পাইকারী হত্যা চলছিল, তখন সুমাত্রায় ইসলামী হুকুমত কায়েম হচ্ছিল। একদিকে কর্ডোভা থেকে ইসলামকে নির্বাসিত করা হচ্ছিল। অন্যদিকে জাভায় তার পতাকা উড্ডীন হচ্ছিল। সিসিলিতে যখন ইসলামকে খতম করার অভিযান চলছিল, জাভায় তখন সে নতুন জীবনী শক্তি লাভ করছিল। একদিকে তাতারীরা ইসলামের গলায় ছুরি চালাচ্ছিল, অন্যদিকে মুসলমান মুবাল্লিগরা সেই তাতারীদেরই হৃদয় জয় করে নিচ্ছিলেন। একদিকে তুর্কীরা ইসলামকে দাসত্বের জিঞ্জির পরাচ্ছিল, অন্যদিকে তারা নিজেদের মন ইসলামের দাসত্বের জন্য পেশ করছিল।

এসব বিজয় তাবলীগ ও প্রচারের বিজয় নয়, তো কি ? আজ পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে দেখুন। ইসলামের যে বিজয়গুলোকে সামরিক বিজয় বলে অভিহিত করা চলে, তা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্পেন ধ্বংস হয়েছে। সিসিলি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। গ্রীস বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু মধ্য আফ্রিকা, জাভা, সুমাত্রা, চীন, মালয়—যাকে ইসলাম প্রচারের অস্ত্র দ্বারা জয় করেছিল—তা যথাযথভাবে বর্তমান এবং তা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলামের অস্তিত্ব একমাত্র তাবলীগ তথা প্রচারের উপরই পরিপূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল। এখন প্রশ্ন হলো, এ প্রচার কি গুটিকয় মিশনারী সমিতির দ্বারা সাধিত হয়েছিল ? এ বিরাট বিজয় কি আজ আমরা যে কর্ম বিমুখ হৈ-হল্লা করছি, সেই ধরনের হৈ-হল্লার ফল ? আজকের মত কাগুজে লড়াই ও পত্র-পত্রিকার সাময়িক আলোচনা-পর্যালোচনার ফলে কি এসব হতে পেরেছে—যে লড়াই আমরা খৃষ্টান মিশনারীদের অনুকরণে করে যাচ্ছি ? ইতিহাস এর জবাবে বলে, 'না'। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা এ বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

ইসলাম কিভাবে প্রচারিত হয়েছিল

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মূলে তিনটি জিনিস অত্যাবশ্যকীয় কার্যকারণ হিসেবে বর্তমান।

প্রথমতঃ ইসলামের সহজ ও সরল আকীদা-বিশ্বাস ও তার চিত্তাকর্ষক ইবাদাত।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের জীবনে ইসলামের শিক্ষা, উপদেশ ও অনুশাসনের বিস্ময়কর প্রভাব।

তৃতীয়তঃ মুসলমানদের জীবনে ইসলামের প্রচার মুখী চরিত্র। প্রথমটি বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আহ্বান জানায়। দ্বিতীয়টি আবেগ ও উদ্দীপনাকে জাগ্রত করে ও প্রেরণা জোগায়। আর তৃতীয়টি একজন স্নেহময় নেতা ও মুরুব্বীর মত ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। বাজারে যেমন কোনো পণ্যের নিজস্ব উৎকৃষ্টতাই তার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি ও প্রসার লাভের জন্য যথেষ্ট নয় এবং সে জন্য এমন কিছু কর্মীরও প্রয়োজন যারা ঐ পণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা লোকদের বুঝাবে। তাছাড়া এমন কিছু সংখ্যক লোকেরও প্রয়োজন যারা উক্ত পণ্য নিজেরা ব্যবহার করে ও তার উপকারিতার বাস্তব সাক্ষ্য প্রদান করবে। ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়ায় ইসলামের প্রচার-প্রসারেও এ তিনটি জিনিসের সমানভাবে ও একত্রে সক্রিয় থাকার প্রয়োজন ছিল। যখনই এর মধ্য থেকে কোনো একটির অভাব পড়েছে তখন অনিবার্যভাবেই তার প্রভাব ইসলামের প্রচার-প্রসারের তীব্রতা ও ক্ষমতায় ভাটা পড়েছে। এ তিনটি জিনিস কিভাবে নিজের ভূমিকা পালন করে, এ কয়টির একত্র সমাবেশে কি ফল দেখা দেয় তা জানার জন্য কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

ইসলামী আকায়েদের সহজবোধ্যতা ও মানব—প্রকৃতির সাথে তার সামঞ্জস্য

ইসলামী আকায়েদ এত সহজ ও হৃদয়গ্রাহী যে, একজন অতি সাধারণ মানুষও তা মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এর ভেতরে না আছে কোনো দার্শনিক জটিলতা, না আছে কোনো কুসংস্কার ও অলীক কল্পনার অবকাশ, না আছে অবাস্তব কথাবার্তার কোনো স্থান।

ইসলাম এমন কতগুলো সরল-সহজ মূলনীতি পেশ করে যা সকল স্তরের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে অনায়াসেই গ্রহণযোগ্য। শুধু তাই নয়, এ মূলনীতিগুলোর এমনই ধন্বন্তরী প্রভাব যে, এগুলো গ্রহণ করে নেবার পর মানুষের মধ্যে অপূর্ব ধরনের আমূল পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকে। তাছাড়া এ আকীদাসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বক্তব্য স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এবং তাতে কোনো রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ মাত্র নেই। খোদা সম্পর্কে এতে সুস্পষ্টভাবে এরূপ আকীদা পেশ করা হয়েছে ঃ

اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج (الانبياء : ١٠٨)

"তোমাদের খোদা, একই খোদা।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৮)

এতে দ্বিত্বের কোনো অবকাশ নেই।

لَاتَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ج (النحل : ٥١)

"তোমরা দুই খোদা গ্রহণ করো না।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৫১)

তাঁর কোনো সাহায্যকারীও প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٥(البقرة : ٢٠)

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"–(বাকারা ঃ ২০)

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ٥(ابرهيم : ٢٧)

"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)

يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ٥(المائدة : ١)

"নিজের ইচ্ছা মতই তিনি সিদ্ধান্ত করেন।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১)

তাঁর সত্ত্বা জনক ও জাতের বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র তার সাথে কারোর তুলনা চলে না।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ٥(الاخلاص : ٣_٤)

"তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি জাতও নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"–(সূরা ইখলাস ঃ ৩-৪)

মানবসুলভ দুর্বলতা থেকেও তিনি মুক্ত।

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط ـ(البقرة : ٢٥٥)

"তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, ঘুম ও তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে না।"

আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি ছাড়া আর এমন কেউ নেই যার কাছে মানুষ সাহায্য ও সহায়তা চাইতে পারে।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ ○(البقرة : ١٠٧)

"তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর? বস্তুত তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১০৭)

উপাসনার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই ঃ

اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّیْنَ ○(الزمر : ١١)

"পূর্ণ আনুগত্য আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁর উপাসনা কর।"

এমনিভাবে রসূলের মর্যাদা সম্পর্কেও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে কোনো রকমের খোদায়ীর সংশয়ের অবকাশ রাখা হয়নি। সুস্পষ্টভাবে এ আকীদা পেশ করা হয়েছে যে, রসূল মানুষ ছাড়া আর কিছু নন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিকট স্বীয় বাণী পৌঁছানোর জন্য একজন মানুষকে রসূল হিসেবে বাঁছাই করেছেন মাত্র।

اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ ـ(الكهف : ١١٠)

"আমি তোমাদের মতই মানুষ। কেবল আমার নিকট 'ওহি' প্রেরণ করা হয়।"–(সূরা আল কাহাফ ঃ ১১০)

পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যার নিকট আল্লাহ একজন হেদায়েতকারী প্রেরণ করেননি ঃ

وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ○(الرعد : ٧)

"প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়েতকারী রয়েছে।"-(সূরা আর রা'দ ঃ ৭)

মানুষের ইহলৌকিক জীবনের কার্যকলাপ, তার দায়িত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে যে, এ ক্ষেত্রে কোনো প্রায়শ্চিত্ত বা অদল-বদলের অবকাশ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেই দায়ী এবং যে যেমন কাজ করবে, সে তেমনি কর্মফল ভোগ করবে ঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

"যে বক্তি কণা পরিমাণও ভালো কাজ করবে সে তাঁর প্রতিদান পাবে আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও খারাপ কাজ করবে সে তাঁর প্রতিফল পাবে।"
-(সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮)

পরকাল সম্পর্কে ইসলাম এই যে সুস্পষ্ট আকীদা-বিশ্বাস পেশ করেছে, পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম এমনটি করেনি। বৌদ্ধ ধর্মের দুর্বোধ্য মুক্তি মতবাদের স্থান যেমন এতে নেই, তেমনি নেই হিন্দু মতবাদের জটিল ও পেঁচালো পুনর্জন্মবাদ এবং জড়বাদের পূর্ণ বিনাশবাদের অবকাশ। এতে বরঞ্চ অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে বলা আছে যে, মানুষ তাঁর বর্তমান জীবনের কার্যকলাপের ফল তাঁর পরবর্তী জীবনে ভোগ করবে এবং সেটাই হবে প্রকৃত জীবন।

এ আকীদাগুলো এত সহজ ও সরল যে, মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি তা অনায়াসেই গ্রহণ করে। ইসলাম প্রচারকদের প্রচারকার্যে ব্যাপক সাফল্যের কারণ এই যে তাঁরা এমন কোনো বক্তব্য পেশ করে না যা গ্রহণ করতে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি অক্ষম বা বিমুখ। জনৈক প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক অধ্যাপক মন্টেইট ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"এত সহজ ও স্পষ্ট যে আকীদা, যে আকীদা দার্শনিক জটিলতা থেকে এতটা মুক্ত এবং সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে এতটা অনায়াসে অনুধাবনযোগ্য, তাতে মানব জাতির মন-মগজে বশীভূত করার এক অভাবনীয় ও বিস্ময়কর শক্তি থাকার কথা এবং বাস্তবিকপক্ষে তার সে শক্তি আছে।"

মানুষের মন-মগজের উপর এ আকীদাসমূহের যে কি গভীর প্রভাব তা একটি ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। একবার আফ্রিকার গালা উপজাতির একটি ক্রিতদাসকে ঝানজ উপকূল থেকে ধরে নিয়ে জেদ্দায় বিক্রি

করে দেয়া হয়। ক্রিতদাসটিকে অতপর স্বাধীন করে দেয়া হয় এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, যারা তোমাকে এভাবে বিনা অধিকারে ধরে এনে জানোয়ারের মত বিক্রি করে দিলো তাদের প্রতি তোমার কি রাগ হয় না? জবাবে নিগ্রো দাসটি বললো ঃ

"হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আমার রাগ হয়। তবে একটি জিনিস আমার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে। সেটা হলো, আমি তাদের কারণেই কুফরীর অন্ধত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। আমি যে এই দেশে আসতে পেরেছি এবং আমি যে ইসলামের মত অপূর্ব নেয়ামত অর্জন করতে পেরেছি, একে আমি আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করি। বিশ্বাস করুন, ঈমানে যে স্বাদ, যে মধুরতা, তার চেয়ে বড় স্বাদ ও মধুরতা আর কোনো বস্তুতেই নেই। এ মধুরতাকে কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। ভাষা দিয়ে তা ব্যক্ত করা যায় না।"

ইসলামী ইবাদাতের চিত্তাকর্ষতা

ইসলামী ইবাদাতগুলোও এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এতে এমন এক চিত্তবিমোহনী শক্তি রয়েছে যে মন্টেস্কুর মতানুসারে কারো মন তা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। আলেকজান্দ্রিয়ার জনৈক ইহুদী ধর্মত্যাগী নও মুসলিম লিখেছেন ঃ

"আমি শুধু মুসলমানদের ইবাদাত দেখে মুসলমান হয়েছি। একবার আমি জামে মসজিদে নামাযের দৃশ্য দেখতে গিয়েছিলাম। সর্বপ্রথম যে জিনিসটি আমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহলো খুত্‌বা। খুত্‌বার প্রতিটি শব্দ আমার মনকে প্রভাবিত করছিল। বিশেষত খতীব যখন বললেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج (النحل : ٩٠)

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচার, সদাচার ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন আর অশ্লীলতা, অন্যায় ও ব্যভিচার থেকে বিরত থাকতে বলেন।" –(সূরা আন নাহল ঃ ৯০)

খতীবের মুখে একথা কয়টি শুনে আমার মন এ ধর্মের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো যার খোদা এমন উচ্চাংগের নীতি শিক্ষা দেন। এরপর

যখন নামায শুরু হলো এবং মুসলমানরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তখন আমার মনে হলো যেন, এরা সব ফেরেশতা দাঁড়িয়েছে আর আল্লাহ্ যেন খোলাখুলি- ভাবে তাদের সামনে দেখা দিয়েছেন। আমার মন বলে উঠলো, বনী ইসরাঈলের সাথে তো আল্লাহ্ দু'বার কথা বলেছেন, আর এ জাতির সাথে তিনি প্রতিদিন পাঁচবার করে কথা বলেন।

নামায এমন এক ইবাদাত যে, এর জন্য না কোনো পাদ্রী-পুরোহিতের প্রয়োজন থাকে, না থাকে কোনো মন্দির-গীর্জার বাধ্যবাধকতা। প্রত্যেক মুসলমান এর ইমাম হতে পারে। সব জায়গায় এর মসজিদ রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পদমর্যাদা ও জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। নামাযের এমন বিস্ময়কর প্রভাব যে, কট্টর থেকে কট্টর ইসলাম বিরোধীরাও এর প্রশংসা করতে বাধ্য হয়ে যায়। এক অদৃশ্য খোদার এমনভাবে ইবাদাত করা হয় যে, শুধু মনে মনে তাঁর কল্পনা করা থেকেই পূর্ণ বিনয় ও আনুগত্যের ভাব জন্মে এবং প্রত্যেক উঠা-বসার থেকে চরম শ্রদ্ধা ও ভীতির ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এতে পাষাণ হৃদয়ও গলে যায়।

পাদ্রী লেফরয়ের সাথে ভারতবর্ষের আলেমদের চাঞ্চল্যকর বাহাছসমূহের কথা সম্ভবতঃ এখনো অনেকের মনে আছে। তিনি তাঁর গ্রন্থ Mankind and Church-এ লিখেছেন ঃ

"মুসলমানদের এ ইবাদাত দেখে কেউই প্রভাবিত না হয়ে পারে না। মুসলমান যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন—রাস্তায় হাটুক, রেলষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাক, দোকানে বসে থাক, কিংবা মাঠে বিচরণ করুক, আযান হওয়া মাত্রই সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এক খোদার সামনে আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে যায়। এ দৃশ্য মানুষের মনে ছাপ না রেখে যায় না। বিশেষতঃ দিল্লীর জামে মসজিদে জুমায়াতুল বিদার নামাযে পনেরো বিশ হাজার মুসলমানকে পরম বিনয়, নিষ্ঠা ও পূর্ণ নীরবতার সাথে নামায পড়তে যে ব্যক্তি দেখেছে সে ঐ দৃশ্য দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। ইসলামের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে যে শক্তি নিহিত রয়েছে, এ দৃশ্য দেখে তা বেশ অনুভব করা যায়। এছাড়া মুসলমানদের প্রত্যহ পাঁচবার নিয়মিত নামায পড়া এবং চরম শোরগোলের মধ্যেও ধীরস্থিরভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করার এ ধারাবাহিকতার মধ্যে এক বিশেষ আবেদন রয়েছে।"

মুসলমানদের জীবনে ইসলামের অনুশাসনের প্রভাব

আকায়েদ ও ইবাদাতের পর যে জিনিসটি নিজের কার্যকর প্রভাবের বলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল, তা হচ্ছে মুসলমানদের ইসলামী জীবন। ইসলাম যদি শুধু নীতি পেশ করেই ক্ষান্ত থাকতো এবং তার শিক্ষা ও অনুশাসনে যদি সেই বিপ্লবী প্রভাব না থাকতো যা চরম সভ্যতা বিবর্জিত জাতিগুলোকে মানবতার উচ্চতর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল তাহলে বোধহয় বিশ্বের মানুষ এর দিকে তেমন আকৃষ্ট হতো না। কিন্তু ইসলাম নীতি পেশ করার সাথে সাথে তার বাস্তব দৃষ্টান্তও পেশ করেছে। বাস্তবিক পক্ষে এ বাস্তব দৃষ্টান্তের চুম্বক শক্তিই মানুষের মনকে এর দিকে আকৃষ্ট করে থাকে।

আল্লাহর একত্ব তাঁর শক্তিমানত্ব এবং একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার ইসলামী শিক্ষা মুসলমানদেরকে এতটা আত্মসম্ভ্রমী, এতটা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ এবং এতখানি সহনশীল, স্বাতন্ত্রবোধ সম্পন্ন ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন করে দিয়েছে যে, তারা দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না, কারও কাছে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে না এবং কোনো বিপদে হতাশ হয় না—তা যত বড়ই হোক না কেন। প্রতিফল, প্রতিদান ও আখেরাতের বিচার সংক্রান্ত ইস-লামী শিক্ষা তাদের মধ্যে এত বীরত্ব ও শৌর্য-বির্যের জন্ম দিয়েছে যে, তারা তাদের বর্তমান জীবনকে নশ্বর মনে করে প্রতি মুহূর্তে তা আল্লাহর পথে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকে। তাদের রক্তের উত্তাপ পৃথিবীতে অতুলনীয়। পরহেজগারী ও আল্লাহভীরুতার শিক্ষা তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক ধরনের ন্যায়পরায়ণতা ও নিঃস্বার্থতার গুণাবলী সৃষ্টি করেছে এবং নেশা, চুরি ও নৈতিক অপরাধ এড়িয়ে চলার ব্যাপারে তারা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। ইসলামী সাম্য ও ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের শিক্ষা তাদের মধ্যে এমন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছে যে, তাদের সমাজে না আছে বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ, না আছে ধনী-নির্ধনের মর্যাদার পার্থক্য, না আছে ভৌগলিক জাতীয়তার বৈষম্যের গোঁড়ামী। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে কোনো ব্যক্তি ইসলামী সমাজের সদস্য হয়ে যায়–চাই সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক কিংবা শ্বেতাঙ্গ, ধনী হোক কিংবা দরিদ্র, মনিব হোক কিংবা দাস। সব অবস্থাতেই মুসলমানরা তাকে ভাই বলে গ্রহণ করবে এবং নামাযের জামায়াতে সে যে কোনো অভিজাত মুসলমানের পাশে দাঁড়াতে পারবে।

এছাড়া মুসলমানদের জীবনে ইসলামের অন্যান্য শিক্ষার প্রভাবও উল্লেখের দাবী রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই

মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানার্জন এবং সভ্যতা ও কৃষ্টির উন্নয়নের সাড়া পড়ে যায়। ইউরোপের খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ দেখে অবাক হয়ে গেছেন যে, আফ্রিকার সভ্যতা বিবর্জিত জাতিগুলোতেও ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই সভ্য জীবনের নিদর্শন ফুটে উঠেছে। মসজিদ নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সামাজিক জীবন, সংগঠন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আর্থিক সচ্ছলতার উৎকর্ষতা সাধন ইত্যাকার গুণ-বৈশিষ্ট্যে আফ্রিকায় সভ্যতা বিবর্জিত সমাজ জীবনকে সুসভ্য ও কৃষ্টিবান জীবনে রূপান্তরিত করেছে। এসব দেখে শুনে অন্যান্য অসভ্য জাতিগুলোও ঐ ধর্ম গ্রহণের দিকে আকৃষ্ট হয়। কেননা ধর্ম তাদেরই স্বগোত্রীয়দেরকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইতিহাসে এ ঘটনা ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে 'বারবার' জাতীয় লোকেরা যখন নাইজেরিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য জিন্নীতে ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন সেখানে প্রচুর সংখ্যক আলেম সৃষ্টি হয়। অবশেষে রাজা যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য একটি পরিষদ গঠন করলেন, তখন সেই পরিষদে দু' হাজার চারশো আলেম যোগদান করেন। ইসলামের এ সভ্যতা মুখী ভূমিকা আরব ও ভারত বর্ষ মিশর ও স্পেনে যে বিস্ময়কর প্রভাব রেখেছে তা এখানে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। ইতিহাসে এর উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে।

ইসলামী সাম্যের প্রভাব

ইসলামী জীবন-যাপনের সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী বস্তু ছিল সাম্য। স্থানীয় রসম-রেওয়াজ ও শক্তিধরদের স্বার্থপরতার দরুন যে জাতিগুলো সাধারণ মানুষের চেয়ে নীচে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল, ইসলাম তাদের জন্য করুণা হয়ে এসেছিল। ইসলাম তাদের জন্য মুক্তিদাতা হয়ে এসেছিল। ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলাম এ ধরনের হাজার হাজার জাতিকে মানবেতর পর্যায় থেকে উঠিয়ে ইজ্জত ও সম্মানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়েছিল। সাম্যের এ অপূর্ব দৃষ্টান্ত ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়েছিল। বিশেষতঃ যেসব এলাকায় এরূপ নির্যাতিত জাতিদের বাস ছিল, সেখানে ইসলামের জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ ছিল এটাই। স্যার উইলিয়াম হান্টার তৎকালীন বাংলাদেশের অবহেলিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"এসব দরিদ্র জেলে, শিকারী ও নিম্নশ্রেণীর কৃষকদের জন্য ইসলাম একটি আসমানী করুণাধারা হয়ে বর্ষিত হয়েছিল। এটা শুধু শাসক জাতির ধর্মই ছিল না বরং এতে এতটা সাম্যও ছিল যে, তারা এটা মেনে নিয়ে যে অভিজাত

হিন্দুরা তাদের ঘৃণা করতো তাদের চেয়েও উচ্চমর্যাদা লাভ করতে পারতো। এ কারণে ভারতবর্ষের সবচেয়ে সচ্ছল প্রদেশটিতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। যদিও কোথাও কোথাও বলপ্রয়োগে ইসলাম প্রচারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে শক্তি প্রয়োগ মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি বরং মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল তার নিজের গুণাবলী। ইসলাম এদেশের মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়েছিল এবং তাদের সামনে মানবতার একটি উচ্চ ধারণা পেশ করেছিল। ইসলাম মানবিক ভ্রাতৃত্বের এমন এক অপূর্ব নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিল যা তারা কখনো দেখেনি এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদের সমস্ত শৃঙ্খল সে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছিল।"

দক্ষিণ ভারতে প্রধানতঃ এ সাম্যের কারণেই ইসলাম হিন্দুধর্মের উপর জয় লাভ করেছিল। আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে টিনাভেলী অঞ্চলে একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনা ঘটে। ঐ অঞ্চলে সানার নামক একটি সম্প্রদায় বাস করে। তৎকালে এ সম্প্রদায়কে নীচ শ্রেণীর সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করা হতো। এরা নিজেদের প্রতিভা ও যোগ্যতার বলে যথেষ্ট বিত্তশালী হয়ে ওঠে এবং শিক্ষা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে সাধারণ হিন্দুদের চেয়ে অনেক উচ্চমর্যাদার অধিকারী হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুরা তাদের সাথে সেই অবমাননাকর আচরণ অব্যাহত রাখে যে আচরণ তারা করতো অচ্ছুতদের সাথে। এতে সানার সম্প্রদায়ের লোকদের মনে মারাত্মক আঘাত লাগে এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি তাদের মন বিরূপ হতে আরম্ভ করে। অবশেষে একবার তাদের সাথে হিন্দুদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কতিপয় সানারের মন্দিরে ঢোকার কারণে হিন্দুরা তাদেরকে ভীষণ মারধোর করে। এতে গোটা সানার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় ৬শ' সানার সেদিনই ইসলাম গ্রহণ করে। আশেপাশের সানাররা যখন এ খবর শুনতে পেল তখন তারাও একে একে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যেও এ মানবিক সাম্য ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ইসলামের প্রচার-প্রসারে সর্বাধিক কার্যকর হয়েছিল। মিঃ ব্লাইডেন তার গ্রন্থ খৃষ্টবাদ, ইসলাম ও নিগ্রো জাতি "(Christanity Islam and Negro Race)"-তে লিখেছেন ঃ

"মুহাম্মদের অনুগামীরা যখনই শুনতে পায় যে, একজন পৌত্তলিক নিগ্রো ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক, তখন সেই নিগ্রো যতই ইতর শ্রেণীর মানুষ হোক না

কেন, তাকে তৎক্ষণাৎ মুসলিম সমাজের একজন সমান মর্যাদাবান সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং শুধু তার মন জয় করার মানসেই নয় বরং সত্যি সত্যি ভাই মনে করেই তাকে সমাদর করা হয়। ফলে সে অনুভব করতে পারে যে, ইসলাম বাস্তবিকই তার জন্য এক অপূর্ব নেয়ামত। বস্তুতঃ আফ্রিকায় ইসলাম যে খৃষ্টবাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে, তার প্রধান কারণ এটাই।

ইসলাম প্রচারে সুফী সাধকদের অবদান

পূর্ববর্তী পাতাগুলোতে ইসলাম প্রচারের দু'টো গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ আলোচিত হয়েছে। এবার এর বাস্তব দিক সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক, এ ঐশী সত্যের প্রতি যারা ঈমান এনেছেন তারা এ সত্যের আলো বিশ্বের সর্বত্র প্রচার করার ব্যাপারে কি পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা করেছেন। একথা সত্য যে, ইসলামের নিজস্ব গুণাবলীই মানুষের কাছে ইসলামকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু দুনিয়ার ব্যাপারে আমরা দিনরাত দেখতে পাই, অতি উত্তম পণ্যও ভালো প্রচার না হলে বিক্রি হয় না। আর বিক্রেতা যদি যোগ্য হয় তাহলে সে খারাপ পণ্যেরও অনেক ক্রেতা পেয়ে যায়। কোনো জিনিসের গুণাবলী মানুষকে না জানালে এবং মানুষের মনে তার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি না করলে সাধারণতঃ কেউই তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সে জন্য প্রত্যেক পণ্যের সাফল্য তার বিক্রেতাদের তৎপরতা, যোগ্যতা ও প্রচারক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। ধর্মের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারেও এ নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম যতই সত্য ও ভালো ধর্ম হোক না কেন, তার প্রচার-প্রসারের জন্য তার নিজের গুণাবলী যথেষ্ট নয় বরং তার অনুসারীদের প্রচারমুখী চরিত্রের অধিকারী হওয়াও প্রয়োজন। সত্য বলতে কি, এ প্রচারমুখী চরিত্রই ইসলামের প্রচার-প্রসারের তিন অপরিহার্য উপকরণের মধ্যে বাস্তব ও কার্যকর উপকরণ।

মুসলমানদের প্রচার মুখী চরিত্রের বিশ্বজনীন প্রসার

আমরা এ যুগের নিষ্ক্রীয় মুসলমানেরা অতীতের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রচারমুখী চরিত্র ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সঠিক কল্পনাও করতে পারি না। এমনকি এ যুগেও আফ্রিকা, চীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলমানদের মধ্যে যে তাবলিগী চরিত্র বিদ্যমান, সেটাও আমাদের ধারণা বহির্ভূত।[১]

তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ইসলামের মাহাত্ম্য মানবজাতির নিকট বেশী বেশী করে পৌছানো। ইসলামের আলোকে তাদের মন ছিল উদ্ভাসিত। পাথরে খোদাই হওয়ার মত তাদের মনে এ

---

১. এ পুস্তক লেখার সময় চীনে কম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হয়নি।—অনুবাদক

বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল যে, মুসলিম হিসাবে মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানো এবং সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করাই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তারা যেখানেই যেতেন, এ উদ্দেশ্য সেখানে তাদের সাথে সাথেই যেত এবং তাদের জীবনের প্রতিটি কাজে তা অনিবার্যভাবেই শামিল হতো। তারা কুরাইশদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করে আবিসিনিয়া গেলেন ; সেখানেও তারা শুধু এ কাজই করলেন। মক্কা থেকে বেরিয়ে মদীনায় তারা যখন শান্তির জীবন লাভ করলেন তখনও তারা তাদের সমগ্র শক্তি এই ইসলামের প্রচারেই নিয়োজিত করলেন। তাদেরকে সাসানী ও রোমক সভ্যতার ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদকে মিছমার করে দেয়ার দায়িত্ব যখন দেয়া হলো তখন সিরিয়া, ইরাক ও রোমেও তারা ঐ পবিত্র দায়িত্বই সমাধা করেছিলেন।

আল্লাহ্ যখন তাদেরকে পৃথিবীর খেলাফত দান করলেন তখন তা দিয়েও তারা আয়েশী জীবনের উপকরণ সংগ্রহ্ করার পরিবর্তে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ চালিয়েছেন। একদিকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা ও অন্যদিকে চীনের সুউচ্চ প্রাচীর তাদের পথের অন্তরায় না হওয়া পর্যন্ত এ কাজ তারা অব্যাহত রেখেছেন। তারা যখন বাণিজ্য পণ্য নিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে বেরিয়েছেন তখনও এ আকাঙ্ক্ষাই তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং তারা আফ্রিকার উত্তপ্ত মরুভূমিতে, ভারতবর্ষের শ্যামল উপত্যকায়, আটলাণ্টিক মহাসাগরের সুদূর দ্বীপসমূহে এবং ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ কুফরীজর্জ্জরিত ভূ-খণ্ডসমূহে ইসলামের আলোকরশ্মী ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ইসলাম প্রচারের এ উদ্দীপনা এত তীব্রতা লাভ করেছিল যে, কারাগারের কঠোরতম যন্ত্রণা ভোগ করার সময়েও তাদের মন থেকে তার আকর্ষণ ম্লান হতো না। তারা কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠসমূহে তাদের কয়েদী সাথীদের কাছে ইসলাম প্রচার করতেন। এমনকি ফাঁসি কাষ্ঠে গিয়ে যদি কোনো অন্তিম আকাঙ্ক্ষা তাদের অস্থির করে তুলতো তবে সেটা আর কিছু নয়—শুধু এটুকু সাধ যে, জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো যেন আল্লাহর দ্বীনের কথা তার বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার মধ্য দিয়ে কেটে যায়।

বেলজিয়ান কঙ্গোর একটা ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। বেলজিয়াম সরকার সেখানকার একজন মুসলিম নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই যে পাদ্রী তাকে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করতে গিয়েছিল, তাঁকে মুসলমান বানিয়ে গেলেন।

অনুরূপভাবে সাইয়েদ মুজাদ্দিদ সরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের কারাগারে তিনি যে দু' বছর কাটিয়েছেন তা শুধু ইসলাম প্রচার করেই কাটিয়েছেন। তার মুক্তির সময় পর্যন্ত কয়েক শো হিন্দু কয়েদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সাম্প্রতিককালে হযরত মাওলানা জাফর থানেশ্বরী (র)-এর দৃষ্টান্তও উল্লেখ করার মত। সীমান্তের মুজাহেদীনের সাথে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে তাকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হলে তিনি সেখানকার বহু সংখ্যক কয়েদীকে মুসলমান বানিয়ে দেন। ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তও আছে যে, সমগ্র পূর্ব-ইউরোপে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়া মাত্র একজন মুসলিম আলেমের একক কৃতিত্ব। খৃষ্টানদের সাথে জিহাদ করার সময় তিনি গ্রেফতার হন। অন্তরীণ অবস্থায় তাঁকে হাত-পা বেঁধে ডানিয়ুব নদের মধ্যবর্তী উপত্যকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তাঁর ঈমানী আলোকচ্ছটা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, অল্পদিনের মধ্যেই ১২ হাজার লোক মুসলমান হয়। ক্রমে ক্রমে হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় গোটা এলাকা ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ইসলাম প্রচারে মুসলিম নারী

এই সর্বাত্মক প্রচার উদ্দীপনা থেকে মুসলিম নারীরাও বঞ্চিত ছিলেন না। তাতারী মোগল হানাদারদের হাত হতে মুসলিম নিধনের তরবারী ছিনিয়ে তাদের গলে ইসলামের আনুগত্যের শৃঙ্খল পরানোর কৃতিত্ব যদি কারো থেকে থাকে তবে সে ছিল এই দুর্বল অথচ ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান মহীয়সী নারীদেরই কৃতিত্ব। এরা ছিলেন সেসব নারী যাদেরকে উক্ত হানাদারেরা মুসলিম দেশসমূহ থেকে দাসী বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গাজান শাহের ভাই ওল্ জাতিভ খানকে তার স্ত্রীই মুসলমান বানিয়েছিল এবং তার বদৌলতেই ইলখানের সরকার ইসলামী সরকার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। চুগতাই বংশ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল। কিন্তু হালাকু খানের মুসলিম স্ত্রী কোররাই সর্বপ্রথম ঐ বংশের লোকদের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান বিস্তার করেন এবং তারই প্রভাবে মুবারক শাহ ও বাররাক খান মুসলমান হন। হাজার হাজার তাতারী সৈন্য তাদের সাথে মুসলিম নারীদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেসব মহীয়সী নারীগণ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে তাদের স্বামীদের ধর্ম গ্রহণ করেননি। বরং তারা তাদের স্বামীদেরকেই, বিশেষতঃ তাদের সন্তানদেরকে বেশী করে ইসলামে দীক্ষিত করে। আর তাদের প্রভাবেই সমগ্র তাতার ভূখণ্ডে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবে আবিসিনিয়াতেও মহিলারাই ইসলাম প্রচার

করেন। ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে এমন বহু নিগ্রো নেতার উল্লেখ পাওয়া যায় যাদেরকে তাদের স্ত্রীরা ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন। সন্নৌসী প্রচারকগণ তো মধ্য আফ্রিকায় নিয়মিতভাবে মহিলাদের প্রতিষ্ঠান দ্বারা ইসলাম প্রচারের কাজ নিতেন। সেখানে আজও মহিলা পরিচালিত বহু ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ভারত বর্ষে ইসলাম প্রচারে সুফী সাধকগণের অবদান

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যে দলটি আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসারে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে সক্রিয় ছিলেন সে হলো এসব সুফী সাধকেরই দল—যারা আজকের ভারতবর্ষে[১] এ ব্যাপারে প্রায় পুরোপুরিই নিষ্ক্রিয়। ভারতবর্ষে আউলিয়া ও সুফীগণ যে অতুলনীয় দৃঢ়তা ও ধর্মীয় নিষ্ঠা নিয়ে ইসলামের আলো বিস্তার করেছেন তাতে আজকের তাসাওউফ প্রচারকদের জন্য গভীর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এখানে সবচেয়ে বড় ইসলাম প্রচারক ছিলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) যাঁর কল্যাণে রাজপুতনায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুরিদগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং ইসলামের বাণী প্রচার করেছিলেন। হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) দিল্লীর চতুর্দিকে, হযরত ফরিদউদ্দীন গঞ্জে শাকার (র) পাঞ্জাব অঞ্চলে, হযরত নিজাম উদ্দীন মাহবুবে ইলাহী (র) দিল্লী ও তার আশেপাশে, হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ গেসুদারাজ (র), হযরত শেখ বুরহানউদ্দিন (র), হযরত শেখ জয়নুদ্দীন (র) এবং শেষের দিকে (আওরঙ্গাবাদের) হযরত নিজামউদ্দীন (রা) দাক্ষিণাত্যে এবং আরো পরবর্তীকালে হযরত শাহ কলিমুল্লাহ জাহান আবাদী (র) দিল্লীতে এ একই কাজ তথা সত্যের দিকে আহ্বান ও ইসলাম প্রচারের মহান কাজ সম্পাদন করেন। এছাড়া অন্যান্য ছেলছেলার আউলিয়া কেরামও এ কাজে অত্যন্ত যোগ্যতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেন। পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেন হযরত সাইয়েদ ইসমাঈল বুখারী (র) যিনি হিজরী ৫ম শতকে লাহোরে আগমন করেন। কথিত আছে, হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে আসতো এবং তাঁর মূল্যবান ওয়াজ শুনতো। একবার যে তাঁর ওয়াজ শুনতো সে ইসলাম গ্রহণ না করে পারতো না। পশ্চিম পাঞ্জাবে ইসলাম প্রচারের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী হযরত বাহাউল হক জাকারিয়া মুলতানীর (র) প্রাপ্য। বাহাওয়ালপুর ও পূর্ব সিন্ধুতে ইসলাম প্রচারিত হয় হযরত সাইয়েদ জালাল

১. এখানে অবিভক্ত ভারতের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত।

বুখারীর (র) কল্যাণে। তাঁর উত্তর পুরুষ হযরত মাখছুম জাহনিয়াঁ (র) পাঞ্জাবের অনেকগুলো গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। অপর দুই বুজর্গ হযরত সাইয়েদ সদরুদ্দীন (র) এবং তাঁর পুত্র হযরত হাসান কবীরুদ্দীন (র)-ও পাঞ্জাবের খুব উঁচুদরের ইসলাম প্রচারক ছিলেন। হযরত হাসান কবীরুদ্দীন (র) সম্পর্কে ইতিহাসে লেখা আছে যে, তাঁর ব্যক্তিত্বে এক আশ্চর্য মোহিনী শক্তি ছিল। শুধু তাঁকে দেখলেই মানুষের মনে ইসলামের সত্যতা ও মহত্বের ছাপ পড়ে যেত এবং লোকেরা আপনা থেকেই তাঁর চার পাশে ভীড় জমাতো।

সিন্ধুতে ইসলাম প্রচারের প্রকৃত যুগ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে ইসলামের পতনের পরের যুগ। এখন থেকে প্রায় ৬শ' বছর আগে হযরত সাইয়েদ ইউসুফুদ্দীন (র) সেখানে আগমন করেন এবং তাঁর কল্যাণে লোহানা সম্প্রদায়ের সাত শ' পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেন। কচ্ছ ও গুজরাটে হযরত ইমাম শাহ পিরানভী (র) ও মালিক আবদুল লতিফ (র)-এর চেষ্টায় ইসলাম প্রচারিত হয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচার করেন হযরত শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র) মুরিদ শেখ জালালুদ্দীন তিবরিজী (র), আসামে ইসলামের প্রদীপ জ্বালেন হযরত শেখ জালালুদ্দীন ফারছী (র) যিনি শাহ জালাল (র) নামে পরিচিত এবং সিলেটে তাঁর কবর রয়েছে। কাশ্মীরে বুলবুল শাহ (র) নামক একজন দরবেশ ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। তাঁর প্রভাবে স্বয়ং রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এ রাজা সদরুদ্দীন নামে পরিচিত। এরপর হিজরী ৭ম শতকে সাইয়েদ আলী হামদানী (র) সাতশো শিষ্যসহ সেখানে আগমন করেন এবং সমগ্র কাশ্মীর ভূ-খণ্ডে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সাইয়েদ শাহ ফরিদ উদ্দীন কাটিয়াবের রাজাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং তার সাহায্যে সমগ্র এলাকায় ইসলাম প্রচারিত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইসলামের সূচনা হয় মহাবীর খামদায়েত থেকে––যিনি আজ থেকে সাতশ' বছর আগে বিজাপুরে আগমন করেছিলেন। হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানীর (র) বংশধর অপর এক বুজর্গ কংকন এলাকায় ইসলামের বাণী প্রচার করেন। ধারওয়াড়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে ইবরাহীম আদিল শাহের পীর হযরত হাশেম গুজরাতী (র)-এর কাছ থেকে। নাছেক এলাকায় হযরত মোহাম্মদ ছাদেক ছারমাস্ত (র) ও খাজা আখোন্দ মীর হোসাইনীর (র) অবদান এখনো স্বীকার করা হয়ে থাকে। মাদ্রাজে যেসব বোজর্গ ইসলাম প্রচার করেন তার মধ্যে সবচেয়ে

বিখ্যাত হলেন হযরত সাইয়েদ নেছার শাহ (র), সাইয়েদ ইবরাহীম শহীদ (র) ও শাহ আল হামেদ (র)। নিউগাওয় ইসলাম প্রচার করেন হযরত বাবা ফখরুদ্দীন (র)। ইনি সেখানকার রাজাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

হযরত সুফী সাহেবানদের এসব প্রচার কার্যের ফল এই হয়েছে যে, হিন্দুদের একটি বিরাট অংশ মুসলমান না হলেও মুসলিম পীর দরবেশদের ভক্ত। ১৮৯১ সালের আদম শুমারীতে বর্তমান ইউ পি রাজ্যের ২৩২৩৬৪৩ জন হিন্দু নিজেদেরকে কোনো দেবতার পূজারী নয় বরং কোনো না কোনো মুসলিম পীরের ভক্ত বলে জাহির করে। পরিতাপের বিষয় যে, ঐসব পীর বুজর্গগণ হিন্দুদের একটি বিরাট অংশের ওপর ইসলামের প্রভাব রেখে গেলেও আমরা সেই প্রভাবকে কোনো কাজে লাগাতে পারিনি।

ভারতের বাইরে

ভারতের বাইরে কয়েকটি ভিন্ন দেশেও এ নেক বান্দাদের প্রচারমূলক তৎপরতা অপূর্ব ফল দর্শিয়েছে। বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এ ঘটনা অনস্বীকার্য যে, তাতারীদের আক্রমণে যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন হলো তখন সমগ্র মধ্য এশিয়ায় শুধুমাত্র সুফী সাধকগণের আধ্যাত্মিক শক্তিই তার মুকাবেলা করার জন্য অবশিষ্ট ছিল। শেষ পর্যন্ত এ শক্তিই ইসলামের এ বৃহত্তম দুশমনদের উপর জয় লাভ করে। তাতারীদের প্রবল প্রতাপ ইসলামের অগ্রগতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। এমনকি এ শক্তির হাতে তাতারীদের শক্তি সমগ্র মধ্য-এশিয়ার প্রায় চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার উপক্রম হয়। মুসলমানদের দূর্ভাগ্য যে, এ প্রচণ্ড শক্তি আজ একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সত্যি বলতে কি, এটা অনৈসলামী সভ্যতার সামনে অনেকখানি পর্যুদস্তও হয়ে পড়েছে।

আফ্রিকায়

বর্তমান সময়ে এ শক্তি শুধুমাত্র আফ্রিকায় জীবন্ত রয়েছে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এ দলের অপূর্ব সাফল্য আমাদের দেশের সুফীগণের জন্য পরম শিক্ষার বিষয়।

এ সুফি দলসমূহের মধ্যে একটি দল হলো "আমিরগনীর দল"। এর প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ওসমান আমিরগনী ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত পূর্ব সুদানে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধির সহায়তা করেন এবং বহু মুশরিক গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

অপর দলটি হলো কাদেরীয়া দল। পশ্চিম-আফ্রিকায় এ ছেলছেলার লোকেরা হিজরী নবম শতক থেকেই বিদ্যমান। ১৯শ শতকে তাদের মধ্যে এক নব জীবনের সঞ্চার হয় এবং তারা পশ্চিম সুদান থেকে শুরু করে টাম্বাকটো ও সেনেগাল পর্যন্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষভাবে নাঙ্গা, টেমো ও মাছারদোতে তারা খুব বড় সংগঠন গড়ে তোলেন ও অনেকগুলো মূর্তি পূজারী গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করে। তাদের নিয়ম হলো, যখন কোনো জনপদে কিছু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করে নেন তখন সেখানকার প্রতিভাবান ছেলেদেরকে নিজেদের কেন্দ্রীয় সংগঠনে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠিয়ে দেন। আর তাদের মধ্যে অধিকতর যোগ্যতা অনুভূত হলে তাদেরকে কিরোওয়ান, ফাস, ত্রিপোলী অথবা আল আজহারে পাঠিয়ে দেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর তাদেরই এলাকায় তাদেরকে প্রচার ও ট্রেনিং-এর কাজে নিযুক্ত করেন। এছাড়া এ দলটি আফ্রিকার অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা কায়েম করে দেন এবং সেখানে সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত গোত্রসমূহের বালকদের ইসলামী ট্রেনিং ও শিক্ষা দেয়া হয়।

"তিজানিয়া" নামে আর একটি ইসলাম প্রচারক গোষ্ঠী আফ্রিকায় সক্রিয় রয়েছে। এটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় আলজিরিয়ায়। কাদেরিয়া ছেলছেলার মতই এদের প্রচার পদ্ধতি। পার্থক্য শুধু এই যে, এ দল প্রচার বা তাবলীগের সাথে জিহাদও করে থাকে। এ কারণে খৃষ্টান মিশনারীরা এর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের অজুহাত পেয়ে যায়। এদের সাংগঠনিক এলাকা প্রধানতঃ উত্তর-আফ্রিকা এবং এর সবচেয়ে সক্রিয় আহ্বায়ক হচ্ছেন আলহাজ্জ ওমর। আলহাজ্জ ওমরের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার খ্যাতি আফ্রিকা থেকে সউদী আরব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইনি ১৮৩৩ সালে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন এবং নাইজেরিয়া ও সেনেগালের মোশরেক গোত্রসমূহকে ইসলামে দীক্ষিত করে এক বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। অবশেষে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এ ইসলামী রাষ্ট্রটির পতন ঘটায়।

আফ্রিকার এসব ইসলাম প্রচারক সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান সংগঠন হচ্ছে সন্নৌসী দল। ১৮৩৩ সালে আলজিরিয়ার প্রখ্যাত আলেম জনাব মুহাম্মদ ইবনে আলী সন্নৌসী সন্নৌসী সংগঠনের পত্তন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের সংশোধন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ ও ইসলামের প্রচার। মাত্র ২২ বছরে তিনি এমন এক শক্তিমান সংগঠন তৈরী করলেন যার

শৃঙ্খলা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার চেয়েও পূর্ণতর ছিল। এর প্রতিটি লোক সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার স্বপ্নে বিভোর থাকতো, এর প্রতিটি সদস্যকে খালেছ ইসলামী প্রশিক্ষণ দিয়ে সাচ্চা মুসলমান বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এতে পবিত্র কুরআনের শব্দে শব্দে অনুসরণ করা একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব শর্ত। এ সংগঠনে আউলিয়া পূজা, মাজার পূজা, কফি ও তামাক সেবন এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সম্পর্ক রাখা নিষেধ। প্রতিটি ব্যক্তি একজন খাঁটি মুজাহিদের মত জীবন যাপন করে। মিশর থেকে নিয়ে মরক্কো পর্যন্ত এবং ত্রিপোলীর সমুদ্রতট থেকে শুরু করে সাহারা মরুভূমির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এর খানকাসমূহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আফ্রিকা ছাড়াও আরব, ইরাক ও মালয়েশিয়া পর্যন্ত এর প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে।

আফ্রিকার যেসব গোত্রের লোকেরা নামমাত্র মুসলমান ছিল, সন্নৌসী দলের কল্যাণে তারা খাঁটি মুসলমানে পরিণত হয়। এছাড়া আফ্রিকার কোণে কোণে তারা ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন। কাদেরিয়া ছেলছেলার লোকেরা যেমন শুধু ওয়াজ নছিহত করেই ক্ষান্ত হন না বরং মুসলমান বানানোর পর নও-মুসলিমদেরকে তাদের স্বগোত্রীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচারের প্রশিক্ষণও দেন তেমনি সন্নৌসী প্রচারকগণও প্রচার কার্যের সাথে সাথে প্রত্যেক নও-মুসলিমকে এক একজন মুবাল্লিগ রূপে গড়ে তোলেন।

আফ্রিকার এই ইসলাম প্রচারক দলসমূহ সেখানকার নিরক্ষর ও সভ্যতা বিবর্জিত গোত্রসমূহের মধ্যে যে নবজীবনের সঞ্চার করেন সে সম্পর্কে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক লিখেছেন ঃ

"নাইজেরিয়া নদীর কিনার দিয়ে যখন আমি মধ্য-আফ্রিকার দিকে রওনা হলাম, তখন প্রথম দু'শো মাইল পর্যন্ত আফ্রিকার উপজাতিগুলোর অসভ্যপনা, বর্বরতা ও নরখাদকতা সম্পর্কে আমার যে ধারণা ছিল তা বদলানোর কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু আমি যখন মধ্য সুদানের নিকট পৌঁছুলাম তখন উপজাতীয় গোত্রগুলোর জীবনে আমি প্রগতির নিদর্শনাবলী দেখতে পেলাম, যা দেখে আমার ধারণা পাল্টে যেতে লাগলো। আমি দেখলাম, সেখানে মানুষ খাওয়ার প্রবণতা নেই, মূর্তিপূজারও অস্তিত্ব নেই, মদখোরী নেশাখোরীও বিলুপ্ত প্রায়। সকল গোত্রের লোকেরা কাপড় পরে। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার ও পবিত্র রাখে এবং আচার-আচরণে ভদ্রতা রক্ষা করে। দেখে স্পষ্টতই মনে হয়, তাদের নৈতিক মান তাদের সমপর্যায়ের অন্যান্য গোত্রসমূহের চেয়ে অনেক

বেশী উন্নত। তাদের সবকিছুই প্রগতিশীল। নিগ্রো প্রকৃতি যেন কোনো উন্নততর প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে আর এসবই হচ্ছে ইসলামের কল্যাণে। 'লোকোজা' নামক জায়গাটা অতিক্রম করার পর আমি মূল ইসলামী প্রচার কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছুলাম এবং সেখানে এক অতি উচ্চাংগের শৃংখলাবদ্ধ প্রশাসন সক্রিয় দেখলাম। চারদিকের লোক বসতিতে সর্বত্র সভ্যতার নিদর্শন পরিস্ফুট। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কারিগরির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে এবং আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটি সুসভ্য দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি।"

৪

আফ্রিকায় ইসলামের প্রসার

আমি আগেই বলেছি, মুসলমানদের মধ্যে কখনোই নিয়মিত ধর্ম প্রচারক সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল না। এর সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, মুসলমানদের ধর্ম প্রচারের কাজকে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত রাখেনি বরং প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এটা সমানভাবে ফরয করে দিয়েছে যে তারা যেন ধর্ম সেবায় নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। খৃষ্টানদের মধ্যে যেমন একটি বিশেষ দল ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা দল ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণও করে না সে ব্যাপারে কোনো আগ্রহও রাখে না, তেমনিভাবে যদি মুসলমানদের মধ্যেও কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা হতো তাহলে হয়তোবা ইসলাম প্রচারের আগ্রহ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমিত থেকে যেত এবং সাধারণ মুসলমানরা তা থেকে একেবারেই বঞ্চিত থাকতো।

ইসলাম একটা গণতান্ত্রিক ধর্ম। ইসলামের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র সৎকাজই হলো শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড। সুতরাং এই ধর্ম কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দুয়ারও সকলের জন্য উন্মুক্ত না রেখে পারে না। এজন্যই পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার অনুসারীদের মধ্যে নিজ ধর্মকে প্রচার করার আগ্রহ সবচেয়ে বেশী ও প্রবল এবং যার অনুসারীদের প্রতিটি ব্যক্তিই মূলতঃ একজন প্রচারক। আমরা ইতিপূর্বে এ প্রচারাগ্রহের ব্যাপকতা ও সর্বসাধারণ মুসলমানের মধ্যে এর উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছি। এবারে আমরা দেখবো, কিভাবে এ সর্বাত্মক প্রচারাগ্রহ দেশের পর দেশ জয় করেছে এবং কাদের হাতে ইসলাম এমন ব্যাপক প্রসার লাভ করতে পেরেছে। উপমহাদেশ, ইরান, মিশর ও আরব বিশ্বের কথা থাক। কেননা এসব জায়গায় মুসলমানরা এক সময় ক্ষমতাসীনও হয়েছিল। তাই ইসলামের বিরোধীরা বলতে পারে যে হয়তো বা এসব দেশে ইসলামের প্রসারে শক্তি প্রয়োগেরও কিছু না কিছু ভূমিকা রয়েছে।

আমরা আফ্রিকা, চীন ও মালয়েশিয়ার দৃষ্টান্ত বিবেচনা করবো। এসব দেশে ইসলাম যে কখনোই শক্তিপ্রয়োগ করার সুযোগ পায়নি সে কথা ইসলামের চরম শত্রুও স্বীকার করবেন। সর্বোপরি তাতার দেশসমূহ এবং তুর্কীস্তানের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার। কেননা এসব দেশ সম্পর্কে ইতিহাসের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, এখানে নিরস্ত্র ইসলাম সশস্ত্র কুফরীর মোকাবিলা করে তাকে পরাজিত করেছে। এসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে

আমরা পাঠকগণকে দেখাতে চাই, ধর্মীয় নিষ্ঠার অধিকারী মুসলমানরা এ পবিত্র ধর্মের কি রকম সেবা করেছেন। আর আমরা যদি এমনি ধরনের ধর্মীয় উদ্দীপনা নিয়ে কাজে লেগে যাই তাহলে আমরা অতি সহজেই ইসলামের প্রচার ও হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম আফ্রিকার বিষয় উত্থাপন করবো।

আফ্রিকায় ইসলামের সূর্যোদয়

যেসব নও-মুসলিম "বারবার" জাতীয় লোক বাণিজ্যোপলক্ষ্যে পশ্চিম সুদানে আসা-যাওয়া করতেন তারাই সর্বপ্রথম সেখানে ইসলাম প্রচার করেন। এ 'বারবার' গোত্রসমূহের মধ্যে লামতোনা ও জাদ্দালা নামীয় গোত্রদ্বয় ইউসুফ বিন তাশফিনের আমলে প্রায় সমগ্র পশ্চিম সুদানকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করে দেন। হিজরী পঞ্চম শতকে এ 'বারবার' বণিকগণই তৎকালীন নিগ্রো রাজ্য ঘানাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এরপর সুদানের প্রাচীনতম রাজ্য সংঘাইও তাদের হাতে ইসলামে দীক্ষীত হয়। হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে তাদের প্রভাব দূর-দূরান্তে পৌছে যায়। এ সময়ে প্রখ্যাত বাণিজ্যিক শহর টামবাকটো ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়। নিগ্রোরা বাণিজ্যোপলক্ষে এখানে আসতো এবং 'বারবার' ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ইসলামের অমূল্য সম্পদ নিয়ে সমগ্র সুদান ও নাইজেরিয়ায় ছড়িয়ে দিতো। এসব লোকের মধ্যে ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এতবেশী ছিল যে, ইবনে বতুতা যখন সেখানে পৌছেন তখন তাদের সম্পর্কে লিখেন ঃ

"এরা কুরআনের প্রেমিক। আর নামাযের প্রতি তারা এমন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ যে, জুমআর দিন সকাল বেলা গিয়ে মসজিদে না বসলে জায়গা পাওয়া অসম্ভব।"

এ নও-মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ইসলাম প্রচারক জাতি ছিল মণ্ডেদু জাতি। নিজেদের আদত অভ্যাস ও সদাচরণের জন্য এঁরা ছিলেন সমগ্র আফ্রিকায় অত্যন্ত খ্যাতিমান জাতি। এঁদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো মধ্য-আফ্রিকার সবচেয়ে প্রতিভাবান, কর্মঠ ও ব্যবসায়ী জাতি রূপে পরিচিত হাউসা জাতি এদেরই চেষ্টার ফলে ইসলাম গ্রহণ করেন। হাউসা জাতি প্রায় সমগ্র সুদান ও নাইজেরিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর একক কর্তৃত্বশীল এবং গায়েনা থেকে কায়রো পর্যন্ত এদের ব্যবসায়ী কাফেলার

নিয়মিত যাতায়াত। ইসলামের প্রসারে এ ব্যবসায়ী জাতির মূল্যবান অবদানের কথা পরে আলোচিত হবে।

পূর্ব সুদানে ইসলাম প্রচার করেন মিশরীয় বণিকগণ। বিশেষভাবে মিশরে যখন ফাতেমী খেলাফতের পতন ঘটে তখন বহু আরব পালিয়ে সুদানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁরা এ অঞ্চলে দূরদূরান্তে ইসলাম প্রচার করেন। তিউনিস ও তানজানিয়ার আরব বণিকগণও এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম সুদানে ইসলাম প্রচার তাঁদেরই একক অবদান। পরবর্তীকালে আহমদ নামক একজন আরব "দারাকোর"-এ ইসলামী শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেন—যা কয়েক শ' বছর পর মুহাম্মদ আলী পাশা নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া পর্যন্ত বহাল থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মধ্য আফ্রিকার মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়। এ জাগরণের ডাক প্রথম আসে শেখ ওসমান দানফেদিও'র পক্ষ থেকে। তিনি শেখ আবদুল ওয়াহাব নাজদীর শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা)-এর সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বিশেষতঃ ফুলবী সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি এমন ইসলামী উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন যে, তারা ইসলামের খেদমতের জন্য আত্মৎসর্গের মনোভাব নিয়ে কাজ শুরু করেন। তারা প্রাচীন 'গোবার' রাজ্য থেকে শেরক ও মূর্তিপূজার উচ্ছেদ সাধন করে সমগ্র 'হাউসাল্যাণ্ড'-কে কুফরী থেকে পবিত্র করেন। ১৮১৬ সালে যখন ওসমান দানফোদিও ইন্তেকাল করেন তিনি 'হাউসাল্যাণ্ড'-এর সার্বভৌম বাদশাহ ছিলেন এবং তার গোটা সাম্রাজ্যের কোথাও শেরক ও মূর্তিপূজার নাম নিশানা পর্যন্ত ছিলো না। ১৯০০ সালে ইংরেজরা এ ইসলামী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। কিন্তু ফুলবী ও হাউসা জাতির ইসলাম প্রচারের স্পৃহা তাতে বিন্দুমাত্রও ম্লান হয়নি। এর জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, এ বিংশ শতাব্দীতেই তারা 'ইউরোবা' অঞ্চল থেকে মূর্তিপূজার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সেখানে ইসলামের আলো বিস্তার করেন। তারা নাইজার নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত সত্য দ্বীনের প্রসার ঘটান। 'উজিবু' অঞ্চলে তারা ১৮৯৪ সালে প্রথম প্রচারকার্য শুরু করেন এবং কয়েক বছরেই এত অগ্রগতি অর্জন করেন যে, ১৯০৮ সালে সেখানকার এক শহরে বিশটি এবং অপরটিতে বারোটি মসজিদ নির্মিত হয়।

এমনিভাবে নাইজার নদীর দক্ষিণ তীরে তারা ১৮৯৮ সালের পর ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং ১৯১০ সালের মধ্যেই প্রায় সব কটি গোত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল মুসলমানদের আর একটি প্রচার ক্ষেত্র। গায়েনা, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া ও মাণ্ডী[১] প্রভৃতি উপকূলীয় অঞ্চলে আজ থেকে প্রায় সোয়াশ' বছর আগে মুসলিম বণিকগণ ইসলাম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার অন্ধত্ব ও মূর্খতাকে সভ্যতায় রূপান্তরিত করেন। ১৮০২ সালে সিয়েরালিওনের এক ইংরেজ কোম্পানী বৃটিশ কমন্স সভায় একটি আবেদন পত্র পেশ করে। তাতে লেখা হয়েছিল ঃ

"এখান থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে আজ থেকে ৭০ বছর আগে কতিপয় মুসলিম বণিক এসে বসতিস্থাপন করে। অন্যান্য জায়গায় মুসলমানদের মত তারা এখানেও মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপন করে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার করতে আরম্ভ করে এবং এরূপ সংকল্প গ্রহণ করে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে দাস হিসেবে বিক্রী করা হবে না। অল্প দিনের মধ্যেই এখানে উন্নতমানের কৃষ্টি ও সভ্যতার চিহ্ন পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে প্রাচুর্যও বেড়ে যায়। ক্রমে এ এলাকায় ইসলামের প্রভাব সবকিছুর ওপর বিজয়ী হয়ে ওঠে। লোকেরা দলে দলে মুসলমানদের ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। মনে হয়, শীঘ্রই গোটা অঞ্চল ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাবে।"

সিয়েরালিওনে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে ডঃ ভেমার লিখেছেন ঃ

"এখানকার মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য কোনো বিশেষ দল নির্দিষ্ট নেই বরং এদের প্রতিটি ব্যক্তি ইসলাম প্রচারকারী। যেখানেই ৫/৬জন মুসলমানের বসতি হয়েছে, সেখানেই একটা মসজিদ হয়ে গেছে। আর সেই ক্ষুদ্র ঘরটিই ঐ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এদের নিয়ম কানুনও খুব সহজ। যে ব্যক্তি কালেমা পড়ে। নামায পড়া ও মদ ত্যাগ করার অঙ্গীকার করে সে তাদের বিশ্বজোড়া পরিবারে সদস্য হয়ে যায়।"

গায়েনায় ইসলামের সবচেয়ে সক্রিয় প্রচারক হাউসা সম্প্রদায়ের বণিকগণ। তাঁদের মার্জিত সামাজিক আচার-পদ্ধতি ও বিশিষ্ট রীতিনীতি অসভ্য গোত্রগুলোকে তাদের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে এবং সাফল্যের সাথে তারা

---

১. এটি সিয়েরালিওন থেকে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি অঞ্চল।

তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করে। দাহোমী ও আশানতিতে খুব অল্পদিন হয় কাজ শুরু হয়েছে। এজন্য সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকায় শুধুমাত্র এ দু'টি অঞ্চলেই এখনো পর্যন্ত সামান্য কিছু কুফর ও মূর্তিপূজার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। লাগোসে মুসলমানদের শক্তি অত্যন্ত প্রবল। এখানে তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে ফুলবী, হাউসা ও মণ্ডেদু—এ তিন সম্প্রদায়েরই কিছু না কিছু লোক রয়েছে। বাণিজ্যোপলক্ষে তাঁদের অনেক দূর-দূরান্তে যেতে হয়। এজন্য তাদের কল্যাণেই সমগ্র নাইজেরীয় উপকূল ও গোণ্ডকোষ্ট ইসলামের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। সেনেগালের মোহনা থেকে লাগোস পর্যন্ত দীর্ঘ দু' হাজার মাইল ব্যাপী উপকূলে বলতে গেলে এমন একটি বসতিও নেই যেখানে অন্ততপক্ষে একটি মসজিদ ও একজন মৌলভী নেই। এসব এলাকায় বসবাসরত প্রতিটি মুসলমান তা সে ব্যবসায়ী হোক কিংবা বৃটেন ফ্রান্স কিংবা বেলজিয়ামের কর্মচারী হোক যে কোনো কাফের ও মূর্তিপূজারীর সাথে সাক্ষাত হলেই সবার আগে তার কাছে কুরআনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়াকে সে তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব বলে মনে করে। এমন প্রচণ্ড প্রচার স্পৃহা খৃষ্টান মিশনারীদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করে দিয়েছে।"

পূর্ব আফ্রিকাও আরব বণিকদের মাধ্যমেই ইসলামের মত শ্রেষ্ঠ নেয়ামত লাভ করে। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তারা সমগ্র ঝাঞ্জ্ উপকূলে ইসলামের আলো বিস্তার করেন এবং স্থানে স্থানে মুসলিম বসতিস্থাপন হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রচার কার্য শুরু হয় তখন যখন জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও ইটালী প্রভৃতি এসব দেশে উপনিবেশ কায়েম করে এবং দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছুবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। সে সময়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ঐসব উপনিবেশের মুসলমানদের সাহায্য নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ফলে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিচার বিভাগ, শিক্ষাঙ্গন, রাজস্ব—মোটকথা প্রতিটি বিভাগে মুসলমানদেরকে ভর্তি করা হয়। তারা আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে পৌঁছে ইসলাম প্রচারে সর্বাধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তারা বোন্দী ও ভদেগু গোত্রকে প্রায় পুরোপুরিভাবে মুসলমান বানিয়ে ফেলে। ১৯০৫ সালের পর তারা পশ্চিমে টাঙ্গানাইকা, উত্তরে ওসাম্বারা ও দক্ষিণে নায়াসা পর্যন্ত কুরআনের শিক্ষা বিস্তারের কাজে ছড়িয়ে পড়েন। ১৮৯১ সালে ওয়াসাম্বারাতে একজনও মুসলমান ছিল না বরং কোনো মুসলমানের উপস্থিতিকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। কিন্তু নিয়মিত সরকার প্রতিষ্ঠা হতেই এবং মুসলিম অফিসারদের সেখানে যাওয়ার পর থেকেই লোকেরা উক্ত অফিসারদের সংস্পর্শে এসে একে

একে মুসলমান হতে আরম্ভ করলো। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত ছিল সেখানেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এভাবে নায়াসাল্যাণ্ডেও দশ বছরের মধ্যে ইসলামের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। খৃষ্টান মিশনারীরা স্বীকার করে থাকেন যে, এসব এলাকায় মুসলমান হওয়া মানুষ হওয়ারই নামান্তর।

কেপ উপনিবেশে ইসলাম প্রচার করেছেন মালয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম বণিকগণ। এরা হল্যাণ্ড সরকারের কর্তৃত্বাধীন বলে অনেক দিন ধরে ওখানে থেকেছেন এবং অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে ইসলাম প্রচার করেছেন। ১৮০৯ সালে কোলব্রুক লিখেছিলেন ঃ

"আমাদের মিশনারীদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম প্রচারকগণ কৃষ্ণকায় দাসগণকে ও স্বাধীন লোকদেরকে সাফল্যের সাথে মুসলমান বানিয়ে ফেলছে। আমাদের প্রচারকরা বহু সময় ও টাকা খরচ করে অতি কষ্টে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোককে খৃষ্টান বানায়। কিন্তু মুসলিম প্রচারকগণ বিনা পরিশ্রমেই বিপুল সংখ্যক লোক হস্তগত করতে সক্ষম হচ্ছে।"

বিগত ৫০/৬০ বছরে বাইরের মুসলমানরাও ঐসব এলাকায় পৌঁছে গেছে এবং তারা ইসলাম প্রচারে নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছে। বর্তমানে বিশেষভাবে ক্রেরামতিন্টে ইসলাম প্রচারের গতি অধিকতর বেগবান। এখানে বিপুল সংখ্যক ইয়াতীম ও অনাথ বালক-কিশোর ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আফ্রিকায় ইসলামের যে অবস্থা এ অধ্যায়ে আলোচিত হলো তা এই রচনা প্রকাশিত হবার সময়কার অর্থাৎ এখন থেকে ৫০ বছর আগেকার ঘটনা। বর্তমানে আফ্রিকায় ইসলামের অবস্থা এর চেয়ে অনেক বেশী সংহত, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।—অনুবাদক

চীনে ইসলাম প্রচার

আফ্রিকার পর মুসলমানদের সফল প্রচারাভিযানের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো দূরপ্রাচ্য। এখানে শুধুমাত্র বণিকগণ, সিপাহীগণ এবং বিভিন্ন পেশার সাধারণ মুসলমানগণ নিজ স্বভাবসুলভ প্রচার স্পৃহা ও ধর্মীয় আবেগের বশেই ইসলাম প্রচার করেন। তারা কখনো আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ না করেও এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনমূলক আক্রমণের শিকার হয়েও নিজ ধর্মের প্রচার-প্রসারে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেন। সেই সাফল্যের কারণেই বর্তমানে চীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে সব সমেত অন্ততঃ ৮/৯ কোটি মুসলমানের বাস।

চীনে ইসলামের প্রথম সূচনা হয় বনু উমাইয়ার যুগে। অবশ্য আরব সাগর থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যে আরব বণিকগণ ছড়িয়ে পড়েছিলেন তারা খোলাফায়ে রাশেদীনের পুণ্যময় যুগেই চীন ভূখণ্ডেও ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে এ জাতি ইসলামের সাথে যথার্থভাবে পরিচিত হয় বনু উমাইয়া শাসনামলে—যখন চীনের সাথে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে যখন জনৈক ষড়যন্ত্রকারী সম্রাট সোয়ানসোংকে সিংহাসনচ্যুত করে তখন তার পুত্র খলিফা মানসুর আব্বাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। খলিফা তার সাহায্যার্থে চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাদেরই বাহুবলের কল্যাণে সম্রাট সোয়াসোং পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। এই সৈন্যরা সত্যিকার ইসলাম প্রচারক ছিলেন। তারা এরপর আর দেশে ফিরে যাননি। বরং চীনেই বসবাস স্থাপন করেন এবং ওখানেই বিয়ে করেন। তারা সাধারণ চীনা জনগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ চালু করেন। ফলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ক্যান্টেম অঞ্চল ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়।

ইসলাম প্রচার—স্তরে স্তরে

এ ঘটনার ছয়শ' বছর পর আর একবার চীনে বাহির থেকে ইসলাম প্রচারকগণ প্রবেশ করেন এবং তারা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এরা ছিলেন আরব, ইরান ও তুরস্কের মুহাজির। হিজরী ৭ম শতকে তারা মঙ্গোলীয় আক্রমণের শিকার হয়ে দেশ ত্যাগ করে এখানে চলে আসেন। এদের কারণে একশ' থেকে দেড়শ' বছরের মধ্যে চীনের অধিকাংশ অঞ্চল ইসলাম বিস্তার

লাভ করে। বিশেষতঃ উত্তর ও পশ্চিম চীনে বড় বড় অঞ্চল ইসলামে দীক্ষিত হয়। ১৩শ' শতকে মার্কো পোলো লিখেছেন যে, প্রায় সমগ্র উনান প্রদেশ মুসলমান হয়ে গেছে। ১৪শ' শতকের অন্য একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, 'তালিফো'র সমস্ত অধিবাসীরা মুসলমান। দক্ষিণ চীন সম্পর্কে ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, সব শহরগুলোতেই মুসলিম মহল্লা রয়েছে। এসব মহল্লার সকল অধিবাসী মুসলমান এবং তারা তাদের ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। মুসলমানরা চীনা মহিলাদেরকে বিয়ে করে এবং তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। এজন্য খুব দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে। ১৫শ' শতকে আলী আকবর নামক জনৈক মুসলিম বণিক লিখেছেন যে, পিকিং-এর প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলিম পরিবার বাস করে। ১৭শ' শতকের শুরুতে চীনা ইহুদীদের একটি বিরাট দল মুসলমান হয়ে যায়। ১৮শ' শতকের কিন লং জিঙ্গারিয়ার বিদ্রোহ দমন করার পর সেখানে দশ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসিত করেন। এই দশ হাজার পরিবারের সকলেই পার্শ্ববর্তী মুসলিম জনবসতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। শানতোং অঞ্চলে এক দুর্ভিক্ষের সময় মুসলমানরা দশ হাজার চীনা বালককে আশ্রয় দেয় এবং তারা সকলেই পরে ইসলামে দীক্ষিত হয়। অন্য একটি দুর্ভিক্ষের সময় কোয়ান তুং অঞ্চলে প্রায় দশ হাজার চীনা বালক মুসলনাদের হস্তগত হয় এবং তাদের সকলকে ইসলামী ট্রেনিং দিয়ে লালন-পালন করা হয়।

এ ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা ছাড়াও সাধারণ অবস্থায়ও মুসলমানরা এত বেশী পরিমাণে প্রচার কার্য চালাতেন যে, সাইয়েদ সোলায়মান নামক জনৈক চীনা মুসলমানের সাক্ষ্যমতে প্রতি বছর নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা কঠিন।

এ যুগেও চীনা মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ঝোঁক রয়েছে। ব্যবসায়ী ও কারিগর ছাড়াও সরকারের মুসলিম কর্মচারীরা নিজ নিজ পরিচিত মহলে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করে থাকেন। চীনা সেনাবাহিনীর মুসলিম সিপাহী ও অফিসাররাও এ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। চীনা মুসলমানরা ইসলাম প্রচারের যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। এজন্য প্রথমে কানসু প্রদেশে এবং পরে আরও দশটি প্রদেশে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনে বাহির থেকে আসা মুসলমানদের সংখ্যা হয়তো এক লাখের বেশী হবে না। কিন্তু এই বিশ্বজনীন প্রচার স্পৃহাই তাদের সংখ্যা ৫ কোটিতে পৌছিয়ে দিয়েছে।

এসব দেখে একজন রুশ পর্যবেক্ষক উদ্বেগের সাথে বলেছেন যে, ইসলাম প্রসারের এ গতি অব্যাহত থাকলে একদিন হয়তো মুসলমানরা দূরপ্রাচ্যের রাজনীতির কাঠামোটাই পাল্টে ফেলবে।[১]

১. চীনের ইসলাম প্রচারের এ গতি ১৯২৫ সালের। কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থানের পর এ গতি অব্যাহত তো থাকেইনি বরঞ্চ ১৯৬১ সালের লোক গণনা অনুসারে চীনে মুসলমানের সংখ্যা এক কোটি বলা হয়েছে। এ পরিসংখ্যানের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি।—অনুবাদক

মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রসার

মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচার করেন আরব ও ভারতীয় বণিকগণ। পর্তুগালের সামুদ্রিক ঔপনিবেশিকতার সূচনা হওয়ার আগে এ বণিকরাই ছিলেন চীন ও সমগ্র পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর একক কর্তৃত্বের অধিকারী। তারা স্পেনীয় ও পর্তুগীজদের ন্যায় যুদ্ধজয়ী হয়ে আসেননি কিংবা তারা তরবারীর জোরে ধর্ম প্রচারেও ইচ্ছুক ছিলেন না। তাদের কাছে এমন কোনো শক্তিও ছিল না যার কল্যাণে তারা পরাক্রান্ত শক্তি হয়ে থাকতে পারতেন। তাদের ছিল শুধু ঈমানী শক্তি। তারা সাথে নিয়ে এসেছিলেন এক সত্য ও ন্যায়ের বাণী। এ হাতিয়ার দিয়েই তারা মালয় দ্বীপপু কে জয় করেন। এর সাহায্যেই তারা সরকারসমূহকে পদানত করেন। এ শক্তির বলেই তারা এতটা প্রভাবশালী হন যে, ৬শ' বছরের মধ্যে গোটা দ্বীপপুঞ্জের ৫ কোটির মধ্য থেকে প্রায় ৪ কোটি অধিবাসী মুসলমান হয়ে যায়। প্রাচীন পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা পদে পদে তাদের পথ অবরোধ করে। স্পেন ও পর্তুগালের প্রমত্ত ঔপনিবেশিক লালসা বারবার তাদের ওপর খড়গ তুলেছে। আর হল্যাণ্ডের খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদ তাদের মনোবল ভাঙতে চেষ্টার ক্রটি করেনি। কিন্তু তাদের ইসলামের সেবা করার দুর্দম বাসনাকে কোনো কিছুই পরাস্ত করতে পারেনি। তারা নিজেদের প্রতিভা ও ধন-সম্পদকে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কাজে না লাগিয়ে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির কাজে লাগিয়েছে। তাদের চেষ্টায় গত ছয় শতাব্দীর মধ্যে মালয় দ্বীপপুঞ্জে যেভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, তার ইতিহাস অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

সুমাত্রা

সুমাত্রায় ইসলামের সূচনা হয় ইত্‌জা থেকে। এখানে আবদুল্লাহ্‌ আরিক নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করেন। তারপর তার মুরিদ বুরহান উদ্দীন পারিয়ামান পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম উপকূলে ইসলামের বিস্তার ঘটান। ১২০৫ সালে গোটা ইত্‌জা রাজ্য ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বয়ং রাজাও মুসলমান হয়ে যান। তাঁকে 'জাহানশাহ' উপাধি দেয়া হয়। এখান থেকে বাণিজ্যিক জাহাজে চড়ে ইসলাম উত্তর সুমাত্রায় পৌঁছে। পারলাক ও পাসুরীতে মুসলমানদের বাণিজ্যিক কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪শ'

শতাব্দীতে শেখ ইসমাঈলের নেতৃত্বে মক্কার কতিপয় আলেম সুমাত্রায় আসেন এবং তারা লামবেরী থেকে নিয়ে আরু পর্যন্ত গোটা উপকূল অঞ্চলকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করেন। অবশেষে সামুদ্রা রাজ্যের রাজা মুসলমান হয়ে যান এবং তাকে "আল্ মালিকুস সালেহ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর চেষ্টায় পারলাক রাজ্যও ইসলাম গ্রহণ করে। ইবনে বতুতা তার পর্যটনক্রমে যখন এখানে পৌছেন তখন ক্ষমতাসীন ছিলেন "আল-মালিকুস সালেহ"-এর পুত্র "আল-মালিকুজ জাহের" এবং সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের সাথে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

পালমবাং-এ হিন্দু ধর্মের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। জাভার শ্রেষ্ঠ ইসলাম প্রচারক রাডান রহমত এখানে ইসলাম প্রচার করেন এবং তার পরেও ইসলামের প্রসার অব্যাহত থাকে। পরে যখন এ অঞ্চলে হল্যাণ্ডের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খৃষ্টান মিশনারীদের প্রতিরোধের জন্য মুসলমানরা অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনা শুরু করে দেন তখনই সত্যিকারভাবে এখানে ইসলামের প্রসার ঘটতে আরম্ভ করে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এখানকার পৌত্তলিক অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

দক্ষিণ সুমাত্রায় ইসলামের বিস্তার ঘটে সবার শেষে। এখানে ইসলামের প্রথম প্রচারক ছিলেন জাভাবাসী এক সরদার মিনাক কুমালা বুমী। ইনি বাটনামে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে মক্কায় ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন এবং লাম্পাং-এ বহু সংখ্যক পৌত্তলিক গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এ অঞ্চল যখন চারদিক থেকে মুসলিম রাজ্যের ঘেরাও হয়েছিল তখন ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয়নি। কিন্তু হল্যাণ্ডের মুসলিম পীড়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দ্রুত ইসলামে দীক্ষিত হয়। হল্যাণ্ড শক্তির বলে ইসলামের প্রসার ঠেকাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে মুসলমানদের প্রচার স্পৃহা তীব্রতর হয় এবং তারা খৃষ্টান প্রচারকদের পর্যুদস্ত করেন। একজন মিশনারী বর্ণনা করেছেন যে, একবার পুরো একটা গ্রাম খৃষ্ট ধর্মের প্রাথমিক দীক্ষা নিয়েও সহসা ইসলাম গ্রহণ করে। এমনিভাবে মসজিদের এক ইমামের চেষ্টায় 'সেপরুফ' নামক একটি জেলার সব লোকেরা মুসলমান হয়ে যায়। অপর একজন ধর্ম প্রচারক সম্পর্কে খৃষ্টান মিশনারীরা বলেছেন যে, তিনি দশ বছর ধরে চেষ্টা করে একটা পৌত্তলিক গোত্রকে খৃষ্ট ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামে দীক্ষিত করেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, স্বয়ং হল্যাণ্ড সরকারের বেতনভুক্ত

মুসলিম কর্মচারীরাও ইসলাম প্রচার করেন এবং সরকার তা অপসন্দ করা সত্ত্বেও ঠেকাতে সক্ষম হয়নি।

সুমাত্রা দ্বীপ থেকে ইসলাম পৌছে মালয় উপদ্বীপে। ১২শ' শতাব্দীতে সুমাত্রার বহু সংখ্যক মুসলিম বণিক বাণিজ্যোপলক্ষে সিঙ্গাপুরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এক শতাব্দী পর তারা মালাক্কা বন্দরের নিকট উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাদের চেষ্টায় উপকূলের অধিকাংশ বাণিজ্যিক জনপদ ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের মাধ্যমে মালয়ের অভ্যন্তরভাগে ইসলাম বিস্তার করে। ১৪শ' শতাব্দীতে এখানকার রাজাও আবদুল আজীজ নামক জনৈক আরব বণিকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর তার নাম বদলে রাখা হয় সুলতান মুহাম্মদ শাহ। ১৬শ' শতাব্দীর প্রারম্ভে মালয়ের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য 'কোয়েডা'ও ইসলামের প্রভাববাধীনে এসে যায় এবং ১৫০৫ সালে সেখানকার রাজা পেরাওং মহাওংসা শেখ আবদুল্লাহ নামক জনৈক মুসলমান আলেমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম পাল্টে রাখা হয় সুলতান মুজলাফ শাহ। এই রাজা তার সমগ্র জীবন ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে কোয়েডা রাজ্যের একটি বিরাট অংশকে পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেন।

মালয় থেকে ইসলামের আলো পৌছে থাইল্যাণ্ডে। সিঙ্গাপুরের মুসলিম বণিকরা তা পরে ইন্দোচীন পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন। আজকাল এসব দেশে ইসলামের যেটুকু প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় তা সব ঐ বণিকদেরই চেষ্টার ফল।

জাভা১

মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পৌত্তলিকতা ও হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বেশী প্রভাব ছিল জাভা দ্বীপে। মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও কাল্পনিক খোদার উপাসনাজনিত রকমারি বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও অলিক ধ্যান-ধারণা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৭৬৮ সাল পর্যন্ত মনুর ধর্মশাস্ত্র প্রচলিত ছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামের নীরব প্রচারকগণ কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সেসব গভীর প্রভাব নির্মূল করে দেন। ফলে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক বাদে সমগ্র জাভা দ্বীপের অধিবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে। অধিকন্তু জাভী মুসলমানদের ইসলাম প্রিয়তা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে অধিক।

১. এটা ১৯২৫ সালের ঘটনা। জাভা বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার একটি অঙ্গরাজ্য।

জাভার এ কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনার সূচনা করেন জাভারই একজন বণিক হাজী পুরওয়া। তিনি পাজা জারনের রাজার পুত্র ছিলেন। তিনি রাজকীয় মুকুট ও সিংহাসন—যা উত্তরাধিকার হিসাবে তার প্রাপ্য ছিল—নিজের ছোট ভাই এর জন্য রেখে দেন এবং নিজে ব্যবসা পণ্য নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। এখানে এসে পার্থিব সামগ্রীর পরিবর্তে তিনি আখেরাতের সামগ্রী পেয়ে যান। তারপর নিজের দেশবাসীকে ঐ অমূল্য সম্পদ পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি একজন আরব আলেমকে নিয়ে জাভায় পৌঁছেন এবং সারা জীবন ইসলামের খেদমত করতে থাকেন। এরপর আরব ও ভারতীয় বণিক ও পর্যটকদের দৃষ্টি ঐ দ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁরা ব্যাপকভাবে এখানে আসেন এবং উপকূল এলাকায় ইসলামের আলো বিস্তার করতে থাকেন। এ ধরনের পর্যটকদের সবচেয়ে বড় দলটি আসে ১৪শ শতাব্দীতে মাওলানা সৈয়দ ইবরাহীমের নেতৃত্বে এবং গ্রীস্ফ নামক স্থানে অবস্থান করেন। এ দলটি প্রচারকার্যের কল্যাণেই বর্মণ রাজ্যের রাজা ইসলাম কবুল করেন এবং সেখান থেকে আশপাশের রাজ্যগুলোতে ইসলামের প্রসার ঘটতে আরম্ভ করে। জাভার ইতিহাসে এতবড় সাফল্য সর্বপ্রথম এ দলটির ভাগ্যেই যুটে।

রাডান রহমতের অভ্যুদয়

জাভা দ্বীপের সবচেয়ে বড় ইসলাম প্রচারক রাডান রহমত ১৫শ' শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই এ অঞ্চলে ইসলামকে দারিদ্রের ছিন্ন কুটীর থেকে তুলে রাজকীয় প্রাসাদে ও কর্তৃত্বের আসনে পৌঁছিয়ে দেন। তিনি লালিত-পালিত হন রাজসিক আভিজাত্যে ও বিলাস ব্যসনে। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেও কোনো সিংহাসনের অধিকারী হতে পারতেন কিন্তু আত্মসেবার পরিবর্তে ইসলামের সেবা করার আবেগে তার হৃদয় ছিল পরিপ্লুত। এজন্য তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারকেই নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত করেন। তিনি আল্লাহর প্রত্যাদেশ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও" অনুসারে সর্বপ্রথম নিজের পরিবার থেকেই প্রচারের কাজ শুরু করেন। তিনি স্বীয় নানা চম্পার রাজাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারপর পালপবাং গিয়ে সেখানকার গভর্নর ও নিজের আত্মীয় ভাই আর্যদামিরকে মুসলমান বানিয়ে ফেলেন। এরপর মাওলানা জুমা দাল কুবরাকে সাথে নিয়ে 'মাজা পাহিত' রাজ্যে যান এবং সেখানকার রাজা তথা তাঁর খালুকে ইসলামের দাওয়াত দেন। রাজা নিজে

ইসলাম কবুল করেননি বটে। তবে তাকে এম্পল অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ করে পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে ইসলাম প্রচারের সুযোগ করে দেন। তিনি গভর্নর থাকাকালে এম্পলের প্রায় তিন হাজার পরিবারকে মুসলমান বানান এবং ইসলাম প্রচারকদের একটি বিরাট দলকে পার্শ্ববর্তী সকল দ্বীপ ও রাজ্যে ছড়িয়ে দেন। 'মুদোরা'কে যিনি ইসলামের আলোকে আলোকিত করেন সেই শেখ খলিফা হোসাইন ছিলেন রাডানেরই প্রেরিত। বালমিঙ্গন রাজ্যে যিনি ইসলাম প্রচার করেন সেই মাওলানা ইসহাকও ছিলেন তাঁরই শিষ্য। গ্রিস্ক অঞ্চলে যে রাডান পা পৌত্তলিকতা নির্মূল করেন তিনিও তারই ট্রেনিংপ্রাপ্ত শাগরিদ ছিলেন। স্বয়ং তার উভয় পুত্রও জাভায় খ্যাতনামা ইসলাম প্রচারক ছিলেন। তার দু'জন নিকটাত্মীয় রাডান পাট্টা ও রাডান হোসাইনের সবচেয়ে খ্যাতিপূর্ণ কৃতিত্ব এই যে, তারা হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ 'মাজা পাহাত'কে চূড়ান্তভাবে ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করান। রাডান হোসাইন মাজাপাহাতের সেনাপতি হিসেবে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং রাডান পাট্টা ১৪৭৮ সালে কাফেরী মতবাদকে শেষবারের মত পরাজিত করে মাজাপাহাতকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

পশ্চিম জাভায় ইসলাম প্রচারের কাজ ছিল আরও কঠিন। কেননা সেখানকার হিন্দুরা সাধারণ জাভীদের চেয়ে অনেক বেশী গোঁড়া ছিল। সেখানে অবশ্য মাওলানা হাসান উদ্দীন চায়রিবুনীর মত প্রচারকগণ ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত হিন্দুরা ইসলামের মোকাবিলা করতে থাকে। অবশেষে ১৬শ' শতাব্দীতে সত্যের চূড়ান্ত জয় হয় এবং হিন্দুরাজ্য 'পজাজারান' পুরোপুরিভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়। এভাবে ১২শ' শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৬শ' শতাব্দী পর্যন্ত ৪শ' বছরের মধ্যে জাভা দ্বীপ পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়। হিন্দু মতবাদ কোনো প্রকার রক্তপাত ছাড়াই শুধুমাত্র প্রচারের বলে ইসলামের নিকট নতি স্বীকার করে।

মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ

জাভার পর ইসলামী শক্তির দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ। এখানে ইসলাম প্রচারিত হয় অনেক পরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ বাণিজ্য এবং ইসলাম এক সাথেই পৌঁছে। মুসলিম বণিকগণ জঙ্গী খৃষ্টবাদের মোকাবিলায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাফল্যজনকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। ১৫শ' ও ১৬শ' শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এখানে জাভা ও মালয়ের বণিকরা ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাদের এই প্রচার কার্যের কল্যাণে অল্পদিনের

মধ্যেই সমগ্র মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং চারটি শক্তিশালী ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি ছিল 'টার্ণেট'-এর সরকার। এর সুলতান টার্ণেট আল-মাহেরার একটি বিরাট অংশে শাসন চালাতেন। দ্বিতীয়টি ছিল 'টেডোরের সরকার'। সমগ্র টেডোর, আল-মাহেরার একটি অংশ, সিরামের একটি অংশ এবং নিউগিয়েনার পশ্চিম অংশ এ শাসনের আওতায় ছিল। তৃতীয়টি ছিল সুলতান গুলুলুর—যার শাসনাধীন এলাকার মধ্যে ছিল মধ্য আল-মাহেরা ও উত্তর সিরাম। আর চতুর্থ সরকার ছিল হেজান দ্বীপের সরকার। এর শাসন তেজান দ্বীপ ও ওবি দ্বীপমালার ওপর বিস্তৃত ছিল। এ চারটি রাজ্যই কিছুদিন জ্যোলুস প্রকাশের পর খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদের বিষাক্ত হাওয়ায় ধ্বংস হয়ে যায়। তবে ইসলামের অস্তিত্ব এসব সরকারের করুণার উপর নির্ভরশীল ছিলো না, তাদের করুণায় তার আবির্ভাবও হয়নি। পরে হল্যাণ্ড প্রভৃতি খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এগুলোকে গ্রাস করে নেয়ার পরও মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন সেখানে ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মের স্থান থাকবে না।

এ দ্বীপগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম টেডোর দ্বীপ ইসলামে দীক্ষিত হয়। ১৫শ' শতাব্দীতে শেখ মনসুর নামক জনৈক আরব বণিক এখানকার রাজাকে মুসলমান বানিয়ে তার নাম জামালুদ্দীন রাখেন। ১৫২১ সালে যখন স্পেনীয় বণিকদের দ্বিতীয় দল এখানে আসে তখন শাসক ছিলেন জামালুদ্দীনের পুত্র সুলতান মনসুর এবং তখন ঐস্থানে ইসলামের বয়স হয়েছে মাত্র ৫০ বছর। পর্তুগীজ বণিকদের বর্ণনা মতে টার্ণেটে টেডোরেরও আগে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। ১৫২১ সালে যখন সেখানে পর্তুগীজ দল আসে তখন সেখানে ইসলাম প্রচারের বয়স ৮০ বছর হয়েছে। এ দ্বীপে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে। ওয়াতো মোল্লা হোসাইন নামক জনৈক জাভাবাসী বণিক ওখানে বাণিজ্যোপলক্ষে বসতিস্থাপন করেন। তিনি প্রতিদিন সকালে উচ্চৈস্বরে কুরআন শরীফ পড়তেন। তাঁর তেলাওয়াত শুনে পৌত্তলিকরা মোহিত হয়ে যেতো ও তার কাছে ভীড় জমাতো। এভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বহু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেন। শেষ পর্যন্ত ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং রাজাও গ্রীস্ক গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

আম্বুইনাতে 'পাটিপুটা' নামক জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ী ইসলাম প্রচার করেন এবং জাভা থেকে ইসলামের শিক্ষা বহন করে সমগ্র আম্বুইনা উপকূলে

ছড়িয়ে দেন। তখন ছিল পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের অভ্যুদয়ের যুগ। পর্তুগীজরা শক্তি প্রয়োগ করে এই ধর্মের অগ্রগতি রুখতে চেষ্টা করে। তারা আসলে ক্রুসেড যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু পর্তুগীজদের কঠোর মোকাবিলা সত্ত্বেও সত্য দ্বীনের প্রসার স্তিমিত হয়নি। বরঞ্চ সাধারণ মানুষের মধ্যে তা আরো বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর ১৬শ' শতাব্দীতে যখন পর্তুগাল অভ্যন্তরীণ সংকটে পড়ে তখন আম্বুইনার লোকেরা সমস্ত খৃষ্টান মিশনারীদের মেরে তাড়িয়ে দেয় এবং দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। এ দ্বীপগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার কারণে মালাক্কার অবশিষ্ট দ্বীপগুলোও মুসলমান হয়ে যায়।

বোর্ণিও দ্বীপ

১৫২১ সালে গুলুলুর রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ শতাব্দীতে বোর্ণিও ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়। সর্বপ্রথম 'বাঞ্জার মাসিম' রাজ্যটি ইসলামে দীক্ষিত হয়। তারপর উত্তরে বোর্ণিওর ব্রুনাই রাজ্য মুসলমান হয়। এরপর ১৫৫০ সালে পালম্বাং-এর বণিকগণ সোকডনা রাজ্যে ইসলাম প্রচার করেন এবং ১৫৯০ সালে বোর্ণিওর সবচেয়ে শক্তিমান রাজা মুসলমান হন। তার নাম রাখা হয় সুলতান মুহাম্মদ সফিউদ্দীন। ১৬০০ সালে জনৈক পাশ্চাত্য পর্যটক যখন বোর্ণিও পৌঁছেন তখন তিনি দেখতে পান যে সমগ্র উপকূলীয় এলাকা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ এলাকায় কুফরী ও পৌত্তলিকতার সামান্য প্রভাব রয়েছে। ১৮শ' শতাব্দীর শুরু থেকেই বোর্ণিওর অভ্যন্তরেও ইসলাম প্রচারিত হতে আরম্ভ করে। একদিকে পুঁজিপতি ও সুসংগঠিত খৃষ্টান দলগুলো নিজ ধর্মের প্রচার চালাচ্ছিল। অপরদিকে দরিদ্র ও বিচ্ছিন্ন মুসলমান বণিকগণ ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিল। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ দেখে বিস্মিত হয়েছে যে, খৃষ্টানরা ব্যর্থ এবং মুসলমানরা সফল হয়েছে। তারা মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায় উত্তর বোর্ণিওর একটি বড় সম্প্রদায় 'ইদান'কে মুসলমান বানিয়ে নেয়। মধ্য বোর্ণিওর 'ডাইক' সম্প্রদায়ও খৃষ্টবাদের তুলনায় ইসলামকে ভালো মনে করে।

সিলিবিস দ্বীপ

সিলিবিস দ্বীপেও এই সাধারণ নিয়ম অনুসারেই ইসলাম প্রচারিত হয়। প্রথমে জাভাবাসী ও মালয়ী বণিকরা ইসলামকে উপকূল এলাকায় পৌঁছিয়ে দেয়। তারপর স্থানীয় বণিকদের সাহায্যে তা দেশের অভ্যন্তরভাগে পৌঁছে। ১৫৪০ সালে যখন পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা এখানে আসে তখন সবে

ইসলামের প্রসার শুরু হয়েছে এবং শুধুমাত্র গোভাতে কয়েকজন মুসলমান বাস করতো। ৬০ বছরের মধ্যেই তা এতখানি উন্নতি লাভ করে যে সমগ্র উপকূল এলাকা মুসলমান হয়ে যায় এবং মোকাসের রাজা সমেত ইসলাম গ্রহণ করে। মোকাসের থেকে আলফুর ও বোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের বিস্তার ঘটে। বোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে তো ইসলামের এমন প্রভাব পড়ে যে, এর ফলে তার সমস্ত সহজাত প্রতিভা ও যোগ্যতা জেগে ওঠে। তার মেধা ও কর্মঠতা তাকে মালাক্কা দ্বীপ পুঞ্জের সেরা সুসভ্য জাতিতে পরিণত করে। আজকাল সমগ্র অঞ্চলে একটি ইসলাম প্রচারক সম্প্রদায় হিসেবে এ জাতি সুপরিচিত। নিউগিনি থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত এর বণিকরা নিজস্ব বহর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের প্রভাবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে। এদেরই বদৌলতে সুমবাদা, লোমবোক, চন্দন দ্বীপ, প্রভৃতি সমস্ত দ্বীপে ইসলাম প্রচারিত হয় এবং খোদ সিলিবিস দ্বীপে খৃষ্টবাদ শোচনীয়ভাবে পরাভূত হয়। ১৮শ' শতাব্দীতে খৃষ্টীয় প্রচারকগণ বোলাং ও মেছোণ্ডাও রাজ্যের রাজাকে খৃষ্টান বানিয়ে ফেলেছিল। তার প্রভাবে সমগ্র রাজ্য খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বোগী বণিকগণ এক শতাব্দীর মধ্যে তাকে খৃষ্টবাদের কবল থেকে মুক্ত করেন এবং ১৮৪৪ সালে স্বয়ং রাজা জেকোবিস ইসলাম গ্রহণ করেন।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে

নিরস্ত্র ইসলামের সবচেয়ে অলৌকিক কীর্তি প্রকাশ পেয়েছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। মালয়ের জনৈক ব্যবসায়ী শরীফ কাবুং সুয়ান এখানে ইসলামের ভিত্তি পত্তন করেন। তিনি তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে মিন্দানাও এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে তিনি বিপুল সংখ্যক ফিলিপাইনবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তারপর মুসলিম বণিকদের আগমনও ইসলামের প্রচারের ধারা দীর্ঘ দিন ব্যাপী অব্যাহত থাকে। এখানকার অসভ্য জাতিগুলোর মধ্যে ইসলামের এমন আশ্চর্য প্রভাব হয় যে, ১৫২১ সালে যখন পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা এখানে আসে তখন তারা মুসলমান ও অমুসলমানদের সমাজ, সভ্যতা ও আচরণে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পায়। তারা ভেবে অবাক হয় যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে সভ্যতা বিবর্জিত পৌত্তলিক জাতিগুলোর জীবনে এতবড় বিপ্লব এলো কেমন করে? যেহেতু এখানে ইসলামের প্রভাব ছিল খুবই সাম্প্রতিক। এজন্য ইসলামকে হটিয়ে দিয়ে খৃষ্টবাদ ছড়ানোর জন্য তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্যক্রম গ্রহণ করলো এবং তরবারীর জোরে গোত্রগুলোকে খৃষ্টান বানাতে লাগলো। বিংশ শতাব্দীর সভ্য দিনগুলোর প্রারম্ভ

পর্যন্ত এ কার্যক্রম চালু থাকে। স্পেন এখানে ধর্মের নামে সব রকমের যুলুম-নির্যাতন অব্যাহত রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে খৃষ্টবাদের মোকাবিলায় ইসলাম খুবই দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করেছে। ফিলিপাইনের লোকেরা মিন্দানাও ও সোলো নামক মুসলিম রাজ্যগুলোতে হাজারে হাজারে আসতো এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতো। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন এখানে মার্কিন আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং ধর্মীয় জোর-যুলুমের সমাপ্তি ঘটে তখন ইসলাম প্রচারের সেই প্রবলতা অব্যাহত থাকেনি। তথাপি মুসলিম বণিকগণ ব্যাপকভাবে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিকতম খবর থেকে জানা যায় যে, ফিলিপাইনে নীরবে ইসলাম প্রচারের কাজ আবার নতুন করে চালু হয়ে গেছে।

নিউগিনি

নিউগিনিতে ইসলাম প্রচার সবচেয়ে আধুনিক কালের ঘটনা। এখানে ইসলাম প্রধানতঃ উপকূলভাগে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রথমতঃ এর পশ্চিম অঞ্চল তেজানের সুলতানের শাসনাধীন ছিল। এজন্য ১৬শ' শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম গিনীতে ইসলামের প্রভাব অধিকতর ব্যাপক হয়। ১৬০৬ সালে মুসলিম বণিকগণ তা পশ্চিম উপকূলেও ছড়িয়ে দেন এবং 'উনীম' উপদ্বীপের পৌত্তলিক জনবসতিতে ইসলামের প্রসার ঘটান। তবে এসব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের আসল যুগ ঊনবিংশ শতাব্দী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আদী দ্বীপ ইসলাম গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সিরাম ও গোরামের মুসলমান বণিকগণ পুলাভা প্রভৃতি দ্বীপকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। কাই দ্বীপে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলমানদের নাম-নিশানাও ছিলো না। কেবল বণ্ডা দ্বীপের কতিপয় ব্যবসায়ী সেখানে থাকতেন। সহসা ১৮৭৮ সালে প্রচারের কাজ শুরু হলো। মুদোরা, জাভা ও বামীর মুসলমান ব্যবসায়ীগণ অল্পদিনের মধ্যেই কাই দ্বীপের লোকদেরকে এতবেশী করে মুসলমান বানালো যে, এখন সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ১৬ হাজারেরও বেশী অর্থাৎ মোট লোক সংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি।

মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের এ বিস্ময়কর সাফল্য ছয় শতাব্দীর নীরব প্রচারের ফল। এ প্রচার কার্য সম্পাদন করেছেন প্রধানতঃ ব্যবসায়ীরা ও সাধারণ পর্যটকরা। তাদের কাছে কোনো তরবারীও ছিলো না, কোনো আধিপত্যকারী শক্তিও ছিলো না। ছিল শুধু আল্লাহর দ্বীন প্রচারের এক অনিবার্য উদ্যম ও উদ্দীপনা। এ উদ্দীপনার জন্যই তারা বিদেশ ভ্রমণের বিপদ ও ঝুঁকি

এবং বাণিজ্যিক লাভালাভের চরম ধনবাদী জীবনের মধ্যে ইসলামের সেবার জন্য আত্মনিবেদিত থেকেছেন। এজন্য তাদের মধ্যে এমন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল যে, তারা অন্য সব উদ্দেশ্যকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখতেন আর ইসলাম প্রচারকে প্রাথমিক লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতেন। আধুনিক যুগেও, যখন একমাত্র আফ্রিকা ছাড়া সারা দুনিয়ার মুসলমানরা ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব সম্পর্কে শিথিল হয়ে গেছে, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলমানদের মধ্যে এখনো এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখনো সেখানে ব্যবসায়ীরা ছাড়াও হল্যাণ্ড সরকারের সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তারা মালয়ী ভাষায় এতবেশী সংখ্যক ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ করেছেন যে, কোনো অমুসলিম সরকারী ভাষা হিসাবে মালয়ী ভাষা শিখলে তার ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে উপায় থাকে না। অধিকাংশ সময় তার মুসলমান হওয়া ছাড়াও গত্যন্তর থাকে না।

বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের ডাক

এই দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা আমি শুধু গাল-গল্পের খাতিরেই করিনি। এর উদ্দেশ্য শুধু এই, আমি প্রমাণ করতে চাই যে, ইসলামের ধর্মীয় ও পার্থিব শক্তির মূল উৎসই হচ্ছে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানো, সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা। এর ওপরই ইসলামের গোটা জীবনী শক্তির নির্ভরতা। আর এ কাজের জন্যই আল্লাহ তাআলা মুসলিম নামক জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু কোনো বাণীর স্বভাবগত দাবীই এই যে তাকে ইপ্সিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়া হোক। সে জন্য তাবলীগ বা প্রচার ইসলামের প্রকৃতিরই দাবী। ইসলাম আসলে আল্লাহ তাআলার একটি বাণী এবং এ বাণী প্রেরিত হয়েছে ভূ-মণ্ডলের প্রতিটি আদম সন্তানের কাছে। তাই যে ব্যক্তির কাছেই এ বাণী পৌঁছে যাবে, সে ঐ বাণীকে যতবেশী আদম সন্তানের নিকট সম্ভব পৌঁছে দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত ও দায়িত্বশীল। এ সত্যই কুরআনে কারীমের নিম্নলিখিত আয়াতে বিঘোষিত হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط (ال عمران : ١١٠)

"তোমরাই বিশ্বের সেই শ্রেষ্ঠতম জাতি যাকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী থাকবে।"

এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে সৃষ্টি করেছেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্য থাকা চাই যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

এ দায়িত্বশীলতার অনুভূতি ইসলামের ১৩শ' বছরের জীবনে যে বিস্ময়কর ফল দেখিয়েছে তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে দেয়া হয়েছে। এ বর্ণনাটুকু অধ্যয়ন করে পাঠক এ বিষয়টা খুব ভালো করেই উপলব্ধি করে থাকবেন যে, যে মুসলমানগণ নিজেদের মুসলমানিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তারা।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ(النحل : ١٢٥)

"বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম উপদেশাবলী প্রয়োগ করে আল্লাহর পথে ডাকো" এই খোদায়ী নির্দেশ অতি নিপুনভাবে বাস্তবায়িত করেছেন। আর এ নির্দেশ অনুসারে তারা শুধুমাত্র উপদেশ প্রদান ও প্রচারের শক্তি দ্বারাই বিশাল এক ভূ-খণ্ডকে ইসলামের কাছে নতি স্বীকার করিয়েছেন। আফ্রিকায় বিশাল মহাদেশে কোনো প্রকার লোভ প্রদর্শন জোর-জবরদস্তি এবং ধোঁকা-প্রতারণা ছাড়াই যেভাবে কোটি কোটি মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, চীনে কোনো প্রকার বস্তুগত ও এক নায়কমূলক শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই যেভাবে একের পর এক জনবসতিসমূহ ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করেছে, মালয় দ্বীপপুঞ্জে নিরস্ত্র ও শক্তিহীন বণিকদের হাতে যেভাবে চার-পঞ্চমাংশ জনসংখ্যা এক আল্লাহর অনুগত হয়েছে এবং তাতার ভূমির মুসলিম হন্তা ও খুনি অসভ্যদেরকে দুর্বল নারীগণ ও নিঃসম্বল দরবেশগণ যেভাবে ইসলামের সামনে মাথা নত করিয়ে দিয়েছে, তার শিক্ষাপ্রদ ইতিবৃত্ত আমরা ঐ দায়িত্বানুভূতির ফল দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমাদের মুসলিম ভাইদের সামনে পেশ করলাম। এটা পেশ করার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের ভাইদের মধ্যেও যেন ঐ দায়িত্বানুভূতি কোনো রকমে জাগ্রত হয়।

১৮৫৭ সালের পরবর্তী প্রচারমূলক তৎপরতা

১৮৫৭ সালের ব্যর্থ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের মুসলমানদের ইসলামী সম্ভ্রমবোধে যে মর্মান্তিক আঘাত লাগে, সে আঘাত কিছু দিনের জন্য তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে এবং তার কারণে ১৮৮৫ সালের পর প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজ খুবই দ্রুততার সাথে হতে থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অমুসলিম কর্তৃত্বের প্রভাবে সেই ধর্মীয় অনুভূতি এবং সেই প্রচারস্পৃহা শেষ হয়ে যায়। ইসলামের সেবায় যে ব্যাপক জাগরণ কিছু দিনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল তা পারস্পরিক কুফরী ফতোয়া বিনিময়ে ও পারস্পরিক দাঙ্গা ফাসাদে ব্যয়িত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর

শেষ অর্ধের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ বিস্ময়কর ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে যে, তৎকালে ইসলাম প্রচারের কোনো নিয়মিত ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও নও-মুসলিমদের সংখ্যা প্রতি বছর ১০ হাজার থেকে শুরু করে ছয় লাখ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন ওলামা ও ওয়ায়েজীনের একটি বড় দল সৃষ্টি হয়। তারা নিজেদের জীবন ইসলাম প্রচারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতায় শহরে শহরে ঘুরে হাজার হাজার মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাছাড়া সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেই ইসলাম প্রচারের এমন প্রেরণা জাগে যে, অফিসের কর্মচারীদের থেকে শুরু করে সাধারণ দোকানদার পর্যন্ত ইসলাম প্রচারে রত থাকতো। লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের পুরনো রিপোর্টে দেখা যায়, তৎকালে স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এমনকি একজন উট গাড়ীর চালক পর্যন্ত ইসলাম প্রচারে রত থাকতো।

বর্তমান অবস্থা

এ যুগে ইসলাম প্রচারের এত ধীর গতির কারণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এর পুরো দায়িত্বই আমাদের শৈথিল্য ও ধর্মীয় উদাসীনতার ওপর বর্তায়। নয়তো একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলাম আগে যা ছিল এখনো তাই আছে। এর প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি, আসতে পারেও না। তবে আমাদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। আমাদের চরিত্র পাল্টে গেছে। আমাদের আবেগ অনুভূতি বদলে গেছে। এ কারণেই আজকের এই অধোগতি। সুতরাং আজ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার নিয়ে যে নাজুক সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান কেবল সভা-সমিতি করলেই হবে না, কেবল পত্র-পত্রিকা বের করলেই হবে না, কেবল হৈ-হল্লা করে সময় নষ্ট করলেও কোনো কাজ হবে না। এর আসল সমাধান হলো, আমাদের মুসলমানদেরকে মুসলমান বানাতে হবে, তাদের মধ্যে সঠিক ইসলামী উদ্দীপনা ও প্রাণ শক্তির সঞ্চার করতে হবে ; তাদের জীবনকে সঠিক ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। তাদের মধ্য থেকে সমস্ত বাতিল আকীদা-বিশ্বাস, বেদাতী রসম-রেওয়াজ ও ভ্রান্ত আদত অভ্যাসগুলো দূর করতে হবে। শত শত বছর ব্যাপী একটি অংশীবাদী জাতির সাথে বাস করতে করতে তাদের মধ্যে এসব জিনিস জন্মেছে। আমাদের যত্নবান হতে হবে মুসলমানদের মধ্যে এমন ধর্মীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে যা প্রতিটি মুসলমানকে ইসলামের সক্রিয় প্রচারকে পরিণত করবে।

আমি বারবার জোর দিয়ে বলেছি যে, মুসলমানরা কোনোদিনও খৃষ্টানদের মত মিশনারী সমিতি বানিয়ে ইসলাম প্রচার করেনি। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, আমরা সংঘবদ্ধতার সাথে কাজ করার বিরোধী। আসল কথা হলো এ কাজটা শুধুমাত্র একটি বা কয়েকটি দলের করণীয় নয়। বরং সে জন্য মুসলমানদের মধ্যে ইসলামকে প্রচারিত ও প্রসারিত করার এক সর্বব্যাপী ও সার্বজনীন উদ্দীপনার সৃষ্টি হওয়া চাই—যেন প্রত্যেক মুসলমান নিজেকে এ মাহিমান্বিত কাজের জন্য দায়িত্বশীল মনে করতে আরম্ভ করে।

শুধু প্রচারক দল না সার্বজনীন প্রচার স্পৃহা ?

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যদি এ সর্বাত্মক প্রচার স্পৃহা ও প্রচার উদ্দীপনা জাগ্রত না হয় এবং শুধুমাত্র একটা বা কয়েকটা সমিতি বানিয়ে তাদের ওপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে একথা সুনিশ্চিতভাবে জেনে রাখতে হবে যে, অমুসলিমদের মোকাবিলায় আমরা কখনোই সফলকাম হতে পারবো না। কেননা সব জায়গায় মুসলমানদের সার্বজনীন প্রচার স্পৃহাই সফলকাম হয়েছে। আফ্রিকায় যদি মুসলমানদের এ সার্বজনীন প্রচার স্পৃহা না থাকতো এবং শুধুমাত্র কতিপয় সমিতিকেই তাবলীগ ও প্রচারের কাজে নিয়োগ করে ক্ষান্ত থাকা হতো তাহলে তাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী ও বিত্তশালী খৃষ্টান সমিতিগুলোর মোকাবিলায় তারা কেয়ামত পর্যন্তও এমন সাফল্য লাভে সক্ষম হতো না, যে সাফল্য তাদের বাস্তবিকই অর্জিত হয়েছে এবং যা দেখে সমগ্র খৃষ্টান জগত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে। এমনিভাবে মালয় দ্বীপপুঞ্জেও যদি সর্বস্তরের বণিক ও পর্যটকদের মধ্যে ব্যাপক ধর্ম প্রচার স্পৃহা সক্রিয় না থাকতো এবং শুধুমাত্র মাঝে মাঝে আগমনকারী আরব ও ভারতীয় ওয়ায়েজীন ও ওলামাই ইসলামের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে ভূমধ্য সাগরের কিনার থেকে আজতক বেশী করে আযানের শব্দ পৌত্তলিক ও খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মিলিত প্রতিরোধ সত্ত্বেও শোনা যাচ্ছে, তা সম্ভবত শোনা যেতো না। এটা সত্যি কথা যে, ইসলাম প্রচার একটা ফরযে কেফায়া। এ কাজ সম্পাদনে কোনো একটা দল আত্মনিয়োগ করলেই সমগ্র উম্মতের জন্য তা যথেষ্ট। কিন্তু শরীয়তের এ উদার বিধান শুধু মুসলমানদের স্বাচ্ছন্দের জন্য তাদেরকে ধর্ম সেবার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়া ও বেপরোয়া করে দেয়ার জন্য নয়। এ উদারতার অর্থ হলো, দায়িত্বটা তো সকল মুসলমানদের উপরই বর্তায় এবং সবারই তা করণীয়। কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে এমন একটা দল অবশ্যই থাকা উচিত যা সবসময় আবশ্যিকভাবে এটা করতে

থাকবে। আর সেই দলটি যে ওলামা ও পুণ্যবান লোকদেরই দল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব আমার মতে ইসলাম প্রচারের সর্বোত্তম পন্থা এই যে, অমুসলিমদের ডাক দেয়ার পরিবর্তে স্বয়ং মুসলমানদেরকেই ডাক দিতে এবং তাদের মধ্যে এমন ধর্মীয় জাগরণ ও প্রেরণার সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রত্যেক মুসলমান এক একজন প্রচারকে পরিণত হয়। এতে করে শুধু যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বই অতি উত্তমভাবে সমাধা হবে তা নয়, বরঞ্চ সেই সাথে আমাদের অনেকগুলো ধর্মীয় রোগও আরোগ্য হবে।

কয়েকটি সংস্কার-প্রস্তাব

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রচারাভিজ্ঞতার আলোকে যে কয়টি সংস্কার প্রক্রিয়া আমার দৃষ্টিতে এ দেশে ইসলাম প্রচারে সহায়ক হবে, তা আমি এখানে উল্লেখ করছি। আশা করি মুসলিম নেতৃবৃন্দ এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন ঃ

(ক) শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপ সাধন

হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশে থাকার কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার বিলোপ সাধন করতে হবে। ইসলামের একটি মৌলিক আকীদাই এই যে, কোনো মানুষ জন্মগতভাবে অপবিত্র বা নীচ নয়। এ আকীদাই মুসলিম সমাজে নিখুঁত সাম্য এনে দিয়েছে এবং এ বিশ্বাসই তার সাফল্যের এক বিরাট কারণ। এখন এ নীতিটাকে পুনরায় আমাদের সকল ব্যাপারে একটা মৌলিক নীতি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(খ) বংশগত বৈষম্যের বিলোপ সাধন

আমাদের দেশে সাধারণভাবে নও-মুসলিমদের, যারা পুরুষানুক্রমিকভাবে মুসলমান—তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা হয়। এটা সম্পূর্ণ অনৈসলামী আচরণ। এটা অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্মূল করতে হবে। নও-মুসলিম স্ত্রী ও পুরুষের সাথে বিয়ে-শাদীর প্রথা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আমাদের দেশের অভিজাত লোকেরা এটা এড়িয়ে চলেন। কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠতম অভিজাত ব্যক্তিও নিজেকে হযরত রসূলুল্লাহ্ (স)-এর চেয়ে অভিজাত বলে দাবী করতে পারে না—যিনি দু'জন নও-মুসলিম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর মেয়ে বিয়ে করেছিলেন এবং অন্য দু'জন নও-মুসলিম হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-কে নিজের মেয়ে দিয়েছিলেন।

(গ) ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উজ্জীবন

মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে যেন অমুসলিমরা তা দেখে ইসলামী সমাজে প্রবেশ করতে আগ্রহী হয়।

(ঘ) সাধারণ ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার সংশোধন

মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ জীবনের সংশোধনের জন্য হয়তো বা কোনো গভীরতর সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে তাদের বাহ্যিক জীবনে এতটা চমক সৃষ্টি করা আবশ্যক যাতে করে অমুসলিমরা আপনা থেকেই তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ, জামায়াত সহকারে নামায পড়া ও রোযা রাখা, শেরকী ও বেদাতী রসম-রেওয়াজ ও শরীয়তের নিষিদ্ধ সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে উপদেশ দিতে হবে, বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্য নৈতিক অপরাধ নির্মূল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। কেননা মুসলমানদের নৈতিক অবস্থা উন্নত হলে অমুসলিমদের মনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগবে।

(ঙ) ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ও প্রচারমূলক তৎপরতায় উৎসাহ প্রদান

জুমআর দিনের ওয়াজ, নৈশ সভা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য সহজ তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। বিশেষতঃ শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ আন্দোলন চালু করা খুবই ফলপ্রসূ। কেননা তারা জনগণের সাথে বেশী করে মেলামেশা করার সুযোগ পান এবং তারা অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রচারের কাজ চালাতে সক্ষম।

শেষ কথা

এ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজ করতে হলে আমাদের ওলামা ও পীর সাহেবানদের নিজ নিজ হুজরা ও খানকা থেকে বেরুতে হবে। ওলামাদের দায়িত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কুরআনে তাদেরকে যে, 'খোদাভীরু' খেতাব দেয়া হয়েছে এবং হাদীসে যে তাদেরকে বনী ইসরাঈলের নবীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে—সেই মূল্যবান মর্যাদা তাদেরকে এমনিতেই দেয়া হয়নি। বরং তাদের ওপর এ উম্মতের সংশোধন ও হেদায়াতের এক অতি

বড় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সে দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলেও তাঁরা আল্লাহর কঠোর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবেন না। তবে আমি হযরত পীর সাহেবান ও সুফী সাহেবানদেরকেও তাঁদের গুরুদায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আজ তারা যে মহিমান্বিত আসনগুলোতে সমাসীন, সেগুলো একদিন আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকার মহান কাজেই নিয়োজিত ছিল। তারা শুধু তাদের পূর্ববর্তীদের আধ্যাত্মিক মহত্ব ও পার্থিব লাভেরই উত্তরাধিকারী নন, বরং তারা অনেকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্যেরও উত্তরাধিকারী। এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি পূর্ববর্তী সুফি ও পীর সাহেবানদের মধ্যে এত তীব্র ছিল যে, তারা অন্য কোনো বিষয়ের কথা ভাবতেও অবসর পেতেন না। একজন মুসলমানকে মুরিদ করার পর তার সংশোধনের ব্যাপারে যে দায়িত্ব পীর সাহেবানদের ওপর অর্পিত হয় তা যদি এখনো তারা অনুভব করেন তাহলে মুসলমানদের বহু সমস্যার সমাধান হতে পারে। বড় বড় গদ্দীনশীন ও পীর সাহেবানদের মুরিদদের সংখ্যা কমপক্ষে এক থেকে দেড় কোটি হবে। এই বিপুল সংখ্যক মুসলমানের ওপর তাদের এমন প্রভাব যে, তাদের ইশারায় তাদের চরিত্র ও জীবনকে পাল্টে দিতে পারেন, এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী প্রেরণার সৃষ্টি করতে পারলে মাত্র কয়েক বছরে এ দেশের চেহারাই পাল্টে যেতে পারে। এমতাবস্থায় এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ তাদের শান্তির নীড় থেকে বেরিয়ে এই দুর্যোগ মুহূর্তে আল্লাহ ও তার সত্য দ্বীনের জন্য কিছু পরিশ্রম করবেন এ আশা কি আমরা করতে পারি না?

ইসলামের উপর বাতিলের হামলা ও তার কারণ

এ দেশের খৃষ্টান মিশনারীরা এ দেশের মুসলমানদেরকে খৃষ্ট ধর্মের দিকে আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে সম্প্রতি কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সেসব প্রস্তাব পত্র-পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। এগুলো পড়ে পাঠকদের মধ্যে কয়জন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে কার্যকর পদক্ষেপের উদ্যোগী হয়েছেন আর কয়জনই বা ঈষৎ পরিতাপ করে আবার নিজ কাজে মন দিয়েছেন তা আমি জানি না। তবে একথা সত্য যে, হৈ-হল্লা করার প্রবণতা আমাদের একটা মজ্জাগত ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল আমাদের এরূপ অভ্যাস হয়ে গেছে যে, যখনই বিরোধীদের কোনো বড় হামলা বা বিশেষ পরিকল্পনার খবর আমরা পাই তখন সহসাই চমকে উঠি এবং বেশামাল ও উদ্বেগাকুল অবস্থায় কিছু অগোছাল ধরনের পদক্ষেপও নিয়ে বসি। আর যে-ই বিপদ একটু কমে যায় অমনি নিশ্চিত হয়ে বসে পড়ি। খৃষ্টান মিশনারী ও আর্য প্রচারকদের নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের ৫০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ দীর্ঘ সময় ধরে তারা অত্যন্ত নীরবে কাজ করেছে। এমন একটি বছর যায়নি যখন তারা নতুন কিছু সংখ্যক লোককে স্বধর্মে দীক্ষিত করেনি। কিন্তু আমরা তাদের নীরবতাকে নিজেদের মত নিষ্ক্রিয়তার লক্ষণ মনে করেছি এবং কখনো নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করিনি। আমাদের অবস্থা মারেবের গ্রামবাসীদের মত। নিজেদের পিতৃ-পুরুষদের বানানো বাঁধকে তারা দেবতাদের নির্মিত বাঁধ মনে করতো। তারা ভাবতো, ঐ বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া বা দুর্বল হওয়া সম্ভব নয় যখন ইঁদুর বাঁধে ছিদ্র করতে শুরু করলো তখনও তারা এই ভেবে নিশ্চিত হয়ে বসে রইলো যে, দেবতাদের নির্মিত এ বাঁধ ভাঙ্গা ইঁদুরের কাজ নয়। কিন্তু সেই ইঁদুরগুলো বহু বছর ধরে একাধিক্রমে চেষ্টা চালিয়ে এতটা সফলতা লাভ করলো যে বাঁধ থেকে পানি চুইয়ে পড়তে লাগলো। পরে কিছুটা পানির প্রবলতায় ও কিছুটা প্রাচীরের ভাঙ্গনে এমন ফল হলো যে, একদিন সহসা বাঁধ একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো এবং দূর-দূরান্তের জনবসতিগুলো পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেল। আমাদের দশাও সেই রকম। ইসলামের বাঁধ ভীষণ মজবুত বলে আমাদের একটা ভরসা আছে। বস্তুতঃ সে ভরসা থাকাও উচিত। কিন্তু আমরা নিজেদের ত্রুটির কারণে সেই বাঁধকে দুর্বল বানিয়ে ফেলছি। তার ফলে ইঁদুরেরা এর মধ্যে ছিদ্র করার চেষ্টা করছে এবং কিছু কিছু সফলও হচ্ছে।

অন্যদের সাফল্য আমাদের অযোগ্যতারই ফল

আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, কি কারণে আর্যপ্রচারকগণ ও খৃষ্টান মিশনারীরা আমাদের মোকাবিলা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারছে। তাদের ধর্মকে যাঁচাই বাছাই করে দেখুন, দেখবেন তা এমন সব হাস্যকর রীতিনীতির সমাবেশ যা তারা আমাদের কাছে পেশ করা তো দূরের কথা নিজেরা কখনো এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বসলে নিজেরাই লজ্জা পাবে। তাহলে এহেন অচল পণ্য নিয়ে তারা কিভাবে বাজারে আসছে এবং কেমন করেই বা সফলতা লাভ করছে ? এর একটা কারণ তো থাকা চাই। এ প্রশ্নের ব্যাপারে চিন্তা করলে স্পষ্টতই মনে হয় যে, তাদের এ সাফল্য তাদের যোগ্যতার নয় আমাদের অযোগ্যতার ফল। তাদের বাণিজ্যের এ চাকচিক্য এজন্য নয় যে, তাদের পণ্য ভালো এবং বাজারে তার চাহিদা আছে। বরং এটা শুধু এজন্য বিক্রি হচ্ছে যে, বাজারে আমাদের পণ্যের কদর আমরাই নষ্ট করেছি। এটা আমাদের সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে, কোনো ব্যক্তি একবার ইসলামের দীক্ষা নিলে পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে এ সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা যদি পেশ করাই না হয় সাধারণ মুসলমানদের কাছে কেবল ঐতিহ্যগত ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামই যদি থেকে যায় এবং তাদেরকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব যদি বুঝানো না হয় তাহলে এর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে ভরসা করা যায় কিভাবে ? আর ভরসা করলেও সে ভরসা টিকবার নিশ্চয়তা কোথায় ?

বিপদের মূল কারণ ঃ আমাদের ধর্মীয় দুর্যোগাদির স্থায়ী উৎস

একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যাবে যে, একমাত্র আমাদের দুর্বলতার জন্যই অমুসলিম প্রচারকরা মুসলমান সমাজে নিজ ধর্মের প্রচার চালানোর ও তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার ধৃষ্টতা দেখিয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে যতদিন এসব দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকবে ততদিন এ বিপদের ঝুঁকিও থাকবে। আমাদের হতভাগা শ্রবণেন্দ্রীয় নিয়তই এরূপ খবর শুনতে থাকবে যে, আজ অমুক জায়গায় আর্য ও খৃষ্টানদের হামলা হয়েছে, আজ অমুক জায়গায় মুসলমানরা বিধর্মীদের টোপের শিকার হয়েছে। সাময়িকভাবে এসব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভাসাভাসা কতিপয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা এবং তারপর নিশ্চিত হয়ে বসে থাকায় এ ব্যাধি দূর হবে না। বরং এতে করে কিছুদিন পর এমন অবস্থা হবার আশংকা রয়েছে যে, আমরা এসব খবর

শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যাব এবং এদিকে মনোযোগ দেয়াই বন্ধ করে দেব। এর যদি কোনো কার্যকর প্রতিকার করতে হয় তবে আমাদের মূল দুর্বলতাগুলোর চিকিৎসায় মনোযোগী হতে হবে এবং তাকে স্থায়ীভাবে নির্মূল করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে করে আমাদের মধ্য থেকে সেই মূল বস্তুটাই দূর হয়ে যাবে যা দুশমনদেরকে আমাদের উপর হামলা চালানোর উৎসাহ যোগায়। আমার দৃষ্টিতে আমাদের এ দুর্বলতা তিন রকমের এবং এগুলোই সমস্ত অকল্যাণের মূল উৎস ঃ

(১) অজ্ঞতা

প্রথমতঃ মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ অজ্ঞ ও মূর্খ। বিশেষতঃ ইসলামের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা এমন পর্যায়ে যে, অনেকে কলেমা পড়াও জানে না। সত্যি বলতে কি, মুসলমান পরিবারে জন্মেও অনেকে নামের মুসলমানও নেই। এজন্য এ ধরনের লোকদেরকে শত্রুরা সহজেই ইসলাম থেকে বিচ্যুৎ করতে সক্ষম।

(২) দারিদ্র

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানরা সীমাতিরিক্ত দরিদ্র। অজ্ঞতা ও দারিদ্র একাকার হয়ে তাদেরকে বিত্তশালী অমুসলিম প্রচারকদের আক্রমণের সহজ শিকার বানিয়ে দেয়।

(৩) ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা

তৃতীয়তঃ মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা হেতু তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হয়। সেখানে তাদের সরল মনের উপর শিশুকাল থেকেই খৃষ্টবাদের ছাপ পড়তে আরম্ভ করে। পরবর্তীকালে এ ছাপই গোপন কিংবা প্রকাশ্য ধর্মান্তরিত হওয়ার সহায়ক হয়।

এই হলো আমাদের ধর্মীয় বিভ্রান্তির স্থায়ী উৎস।[১] এ বিভ্রান্তির কারণ এতো অধিক সংখ্যক যে, তা গুণে শেষ করা যায় না এবং এখানে তার বিস্তারিত আলোচনাও সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, এর মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক জিনিস হলো নিম্নরূপ ঃ

---

১. এটা ১৯২৫ সালের পর্যবেক্ষণের ফল। সতর্ক বিচার-বিবেচনায় দেখা যাবে, এ যুগেও কম-বেশী এগুলোই মুসলমানদের ধর্মীয় অনগ্রসরতা ও বিভ্রান্তির মূল উৎস।–অনুবাদক

মুসলমানদের পরাধীনতা, আলেম সমাজের উদাসীনতা, মুসলিম সমাজে অনৈসলামী রসম-রেওয়াজের প্রচলন, বিশ্ব মুসলিম শক্তির বহুধা বিচ্ছিন্নতা এবং টাকা-পয়সার শক্তি সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে বাস্তব অনুভূতির অভাব —যা তাদের দারিদ্র বৃদ্ধির প্রধান অন্যতম কারণ।

আমাদের সরলতা ও অদূরদর্শিতা বনাম শত্রুদের চতুরতা ও দূরদর্শিতা

উল্লেখিত কারণসমূহ ও দুর্বলতাসমূহের মধ্যে একটিও এমন নয় যার জন্য আমরা নিজেদের ছাড়া কাউকে দোষারোপ করতে পারি। এর কোনোটিরই উৎস আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে নয়। এখন এগুলোর প্রতিরোধের জন্য যদি আমরা প্রচারাভিযান চালাই অথবা সেমিনার সিম্পজিয়াম অনুষ্ঠিত করি অথবা যেসব জায়গায় মুসলমানরা ইসলাম থেকে বিপথগামী হচ্ছে সেখানে আমাদের প্রচারকদের পাঠিয়ে দেই, তাহলে তাতে করে বর্তমান রোগের চিকিৎসা হবে না, ভবিষ্যতের রোগ থেকেও নিরাপত্তা লাভ করা যাবে না। অথচ এ ধরনের কাজই আমরা এ যাবত করে আসছি। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কর্মপদ্ধতি যদি এ রকম হতো, তাহলে হয়তো এভাবে আমরা কিছুটা সফলকাম হতে পারতাম। কিন্তু তারা তো প্রচারাভিযান ও ওয়াজ-নছিহত শুধু আমাদেরকে কর্মব্যস্ত রাখার জন্য একটা চক্রান্ত হিসেবে করে থাকে। নচেৎ আসলে তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব, আমাদের আলেম সমাজের উদাসীনতা, আমাদের জাতীয় অনৈক্য, আমাদের অন্য সমস্ত দুর্বলতাকে পুরোপুরিভাবেই কাজে লাগায়। তারা হাজার হাজার হাসপাতাল স্থাপন করেছে। সেখানে মানবতার সেবার আড়ালে অতি চতুরতার সাথে তারা অজ্ঞ রোগীদের কাছে নিজ ধর্মের প্রচার চালিয়ে থাকে। তারা হাজার হাজার এতিমখানা খুলছে। সেখানে অসংখ্য এতিম বালক-বালিকাদেরকে খৃষ্টবাদের ট্যাবলেট গেলানো হয়। তারা তাদের কার্যক্রমকে এতটা নিখুঁত করে তৈরী করে রেখেছে যে, যেখানেই দুর্ভিক্ষ কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়, সেখানে সমস্ত নিরাশ্রয় লোকদেরকে আশ্রয় দেয়, ভাত-কাপড়ের রিলিফ দেয়ার মাধ্যমে নিজ ধর্ম প্রচার করে থাকে। তারা সারা ভারতবর্ষে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। সেখানে অতি ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে বালক বালিকাদেরকে ধর্মান্তরিত হতে উৎসাহিত করা হয়। তারা নিজেদের মধ্যে

এমন ধৈর্য ও স্থিরতা, এতটা ত্যাগ ও সেবার মনোভাব এবং এমন সাচ্চা ধর্মীয় নিষ্ঠা গড়ে তুলেছে যে, তারা বছরের পর বছর এক জায়গায় চরম একাকীত্ব ও বৈরাগ্যে অবস্থান কাটিয়ে দেয়। তারা যোগী-সন্যাসী ও ফকীর-দরবেশদের জীবন-যাপন করে এবং অতি নীরবে লোকদের মধ্যে নিজ ধর্মের প্রচার চালায়। তাদের মধ্যে এমন গভীর বুদ্ধিমত্তা বিদ্যমান যে, একেবারে খালেছভাবে না হলেও অন্ততঃপক্ষে কৃত্রিমভাবে লোকদের সামনে উঁচু মানের পরহেজগারীমূলক এবং সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করে এবং এমন উন্নত নৈতিক চরিত্র জাহির করে থাকে যে, মৌখিক ও ছাপানো উপদেশের চেয়ে তাদের বাস্তব সদাচরণই বেশী করে প্রচার মাধ্যমের রূপ পরিগ্রহ করে। তদুপরি আমাদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তারা আমাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে থাকে এবং অর্থের শক্তি দিয়ে নিজেদের ধর্ম প্রচারে সাফল্য অর্জন করে থাকে। এ কর্মপদ্ধতি কতখানি গভীর ও কার্যকর তা বুঝতে কারোই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এ যেন এক ভয়াবহ বন্যার তাণ্ডব যা এক সাথে ভীষণ শব্দও করে, দালান কোঠাও ভেঙ্গে চুরে গুড়িয়ে দেয় এবং বড় বড় প্রাসাদের ভিত্তিও ধ্বসিয়ে দেয়। এর মোকাবিলায় মামুলি তক্তা দিয়ে বাঁধ দিলে কিংবা অনুরূপ কোনো লেপপোচ্ দিলে তাতে কোনো কাজ হয় না। এজন্য আমাদেরকেও বিরুদ্ধবাদীদের মতই গভীর ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ আমাদের আত্মরক্ষা চেষ্টার সাফল্য অসম্ভব।

মুসলমান সমাজের যেসব আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও অন্যান্য যেসব অসুবিধার দরুন ভবিষ্যতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম একেবারে খতম না হয়ে গেলেও তার অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আমি ঐ সাথে পাঠকগণের সামনে ইসলামের শত্রুরা ইসলামের শক্তি চূর্ণ করার জন্য যেসব গভীর ও অত্যন্ত কার্যকর চক্রান্ত চালাচ্ছে, তাও তুলে ধরেছি। সেই আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমরাও যতক্ষণ এমনি ধরনের সুদূর প্রসারী ও কার্যকর কৌশল গ্রহণ না করি ততক্ষণ আমাদের ইসলামের রক্ষায় ও প্রসারে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব। এখন সেই রক্ষা ব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত, কি কি কৌশল আমাদের গ্রহণ করা উচিত তাই নিয়ে আলোচনা করবো।

১—ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও ধর্মীয় প্রেরণার উজ্জীবন

আমি আগেই বলেছি, অজ্ঞতাই আমাদের প্রধানতম দুর্বলতা। মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ নিজেদের ধর্মের শিক্ষা এবং তার আকীদা ও আইনগত অনুশীলনাদি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এটাই তাদেরকে ধর্মচ্যুত করার ব্যাপারে শত্রুদের সবচেয়ে বেশী সহায়ক। এদিক থেকে আমাদের প্রথম প্রয়োজন হলো ভারতবর্ষের[১] সমস্ত অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষার প্রসার ঘটানো—ইসলামের সহজবোধ্য আকীদাসমূহ তাদের মনে বদ্ধমূল করে দেয়া দরকার এবং তাদের মধ্যে এতটা ধর্মীয় প্রেরণার সৃষ্টি করা দরকার যেন তারা নামায-রোযার পাবন্দ হয়ে যায়। এজন্য আমাদেরকে সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহর-মোকামগুলোতে একজন করে এমন লোক নিয়োগ করতে হবে যিনি জনগণকে তাদের অবসর সময়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে পারেন এবং তাদের বোধগম্য ভাষাতে তাদেরকে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো ও তার উপকারিতা বুঝিয়ে দিতে পারেন। যদিও এই সাথে অমুসলিমদেরকেও দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। তবে আপাততঃ আমাদের পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে কাফেরদের মুসলমান বানানোর পরিবর্তে মুসলমানদেরকে খাঁটি মুসলমান বানানোর দিকে। মুসলমানদের ঘুমন্ত ধর্মীয় প্রেরণাকে জাগিয়ে তুলতে পারলে আমরা

১. এখানে ১৯২৫ সালের অবিভক্ত ভারতের কথা বলা হয়েছে।–অনুবাদক

আমাদের আভ্যন্তরীণ সমাজ কাঠামোকে বহিরাগতদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করে দিতে পারবো। তারপর অন্যদের দিকে মনোযোগ দেয়ার জন্য আমরা অধিকতর সুযোগ পাব।

২–প্রাথমিক ধর্মীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এই সাথেই দ্বিতীয় যে জিনিসটি প্রয়োজন তাহলো, মুসলমান বালক বালিকাদেরকে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কোনো লম্বা-চওড়া বিধি-ব্যবস্থা বা কোনো বিশেষ শিক্ষা কারিকুলামের প্রয়োজন হয় না। তাদেরকে মুসলমান বানানোর জন্য শুধু এটুকু যথেষ্ট যে, খুব সহজ ভাষায় ইসলামী আকীদাসমূহ তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়ে দিতে হবে। ওযু, মলমূত্র থেকে পবিত্রতা অর্জন, নামায, রোযা প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণ মাসলাসমূহ মুখস্ত করিয়ে দিতে হবে এবং কুরআন মজিদ পড়াতে হবে। কুরআন শরীফ শুধু তোতা পাখীর মত পড়াতেই মানুষের ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে, মনের ওপর ইসলামের মহত্বের ছাপ পড়ে যায় এবং তারপর সেই প্রভাব দূর করা সহজসাধ্য হয় না। সুতরাং আমাদের শিশুদেরকে কার্যকর শিক্ষা দেয়ার ক্ষমতা যদি আমাদের না হয়, তাহলে তাদের কোমল মনে অন্ততঃ কুরআনের ছাপ বসিয়ে দেয়াই উচিত যাতে তাদের ওপর কুফরীর যাদুর প্রভাব না হয়।

এটা হলো সর্বনিম্ন অত্যাবশ্যকীয় কাজ। এটুকু কাজ করতে আমাদের বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করা উচিত। এ কাজের জন্য আলাদা মুবাল্লিগ বাহিনী সফরে পাঠানোর কোনো স্বার্থকতা নেই। বরং এমন লোকের দরকার যারা স্থায়ীভাবে এক জায়গায় থাকবে এবং আর্য মিশনারীদের মত গ্রামীণ জীবনের কষ্ট সহ্য করে পূর্ণ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে ইসলামের খেদমত করতে পারবে। তাদের মধ্যে এতটা সহনশীলতা থাকা প্রয়োজন যেন সাফল্যের সাথে লোকদের মূর্খজনোচিত আচরণের মোকাবিলা করতে পারে। প্রাথমিক ব্যর্থতায় যেন তারা হিম্মতহারা না হয়। শেরেকী ও বেদাতী রসম-রেওয়াজ দূর করতে যদি কয়েক বছরও লেগে যায় তবুও যেন মনোবল না হারায় এবং তাড়াহুড়া করতে গিয়ে মূর্খদের সাথে যুদ্ধ শুরু না করে দেয়। বরং ধীরে উপদেশ দান, শিক্ষাদান ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনকে চরিত্র সংশোধনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এই সাথে তাদের মধ্যে এতটা ত্যাগের মনোভাবও থাকা উচিত যেন তারা এই দরিদ্র জাতির কাছ থেকে ইসলামের খেদমতের জন্য যথাসাধ্য কম পারিশ্রমিক নেয়। জানা কথা যে, খৃষ্টানদের মত কোটি

কোটি টাকা পানির মত গড়িয়ে দেবে, সে সামর্থ এ জাতির নেই। তাদের নৈতিক চরিত্র এতটা পূতপবিত্র হওয়া চাই যেন সরলমতি গ্রামবাসী তাদের কাজ দেখে বিরূপ না হয়। বরং তাদের মহৎ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা যেন নিজেদের মধ্যে এমন ইসলামী চরিত্রের নমুনা পেশ করতে পারে যেন লোকেরা তাদের কাছ থেকে ইসলামী আখলাকের বাস্তব শিক্ষা পায়।

৩—প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপদ্রুতদের পুনর্বাসনের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা

এতক্ষণ যা আলোচিত হলো, তা ছিল প্রথম স্তরের কাজ। এরপর দ্বিতীয় স্তর হলো, মুসলমানদের প্রাকৃতিক দুর্যোগাদির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য আঞ্চলিক পুনর্বাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। এ ব্যবস্থা না থাকার কারণেই উপদ্রুত মুসলমানেরা খৃষ্টান ও আর্য প্রচারকদের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সময় হাজার হাজার পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু গৃহহারা হয়ে পড়ে। সেই বিপদের সময় তাদেরকে আশ্রয় দেয়ার কেউ থাকে না। তাই বাধ্য হয়ে তাদের ধর্ম ও ঈমান বেচে দিয়ে বিত্তশালী খৃষ্টান মিশনারীদের কাছ থেকে পেট বাঁচানোর জন্য ভাত ও লজ্জা ঢাকার জন্য কাপড় সংগ্রহ করতে হয়। এভাবে যেসব শিশুর অভিভাবক নেই তারা কেবল আশ্রয়ের অভাবে দিন-রাত ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা খৃষ্টান অথবা আর্য প্রচারকদের এতিমখানায় আশ্রয় পায়। ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে পরিচালিত মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের এরা চিরন্তন শিকার। কেবলমাত্র মুসলমানদের উদাসীনতাই এ কোমলমতি বালকদেরকে ইসলামের কোল থেকে ছিনিয়ে কুফরীর আবর্তে নিক্ষেপ করে। এদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে হলে স্থায়ী অনাথাশ্রমের প্রয়োজন। অবশ্য খুব ব্যাপক ভিত্তিক একটা ব্যবস্থা যে নিতেই হবে—এমন কথা বলা হচ্ছে না। তাদেরকে মিশনারীদের খপ্পরে পড়া থেকে বাঁচানো যায়, আপাততঃ এতটুকু ব্যবস্থাই যথেষ্ট। অবশ্য তাদেরকে কিছু কাজ দেয়ার এবং কাজ করার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়, সেটা আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে। আপাততঃ আমাদের লক্ষ্য শুধু এটুকু হওয়া উচিত যে, তাদের ইসলামকে রক্ষা করতে হবে। সেটা এভাবে সম্ভব হতে পারে যে, তাদেরকে মুসলিম পরিবারসমূহের আশ্রয়ে দিয়ে দিতে হবে। আর এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সেসব পরিবারে তারা যেন দাসসুলভ

ব্যবহার না পায় বরং খেদমতগারের মত সদয় ব্যবহার পায়। আর যদি কেউ কারিগরি কাজ জানে তবে তাকে কোনো কাজে লাগিয়ে দেয়া যেতে পারে। একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, ইয়াতীম ও অনাথদের এ অবস্থা কিছুতেই সহনীয় নয়। কিন্তু যদি আমাদের জাতির মধ্যে এতটুকু অনুভূতি না থেকে থাকে যাতে করে তারা তাদের শিশু কিশোরদের লালন-পালনের উত্তম ব্যবস্থা করতে পারে তাহলেও এটা সুনিশ্চিত সত্য যে, একজন মুসলমান কিশোরের মুসলমান অবস্থায় খেদমতগার হওয়া, কুফরী বরণ করে নিয়ে ব্যারিষ্টার হওয়ার চেয়ে বহুগুণ শ্রেয় ঃ

৪—মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট করা

একটা জরুরী কাজ হলো, মুসলমান ছেলেদের মিশনারী স্কুল ও কলেজ থেকে তুলে আনার একটা জোরদার আন্দোলন চালাতে হবে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বিস্তার করা নয়। এদের উদ্দেশ্য হলো, বালক-বালিকাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে সেন্টপলের মনগড়া ধর্ম খৃষ্টবাদে দীক্ষত করা। সাধারণভাবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করার অনিবার্য ফল এই দাঁড়ায় যে, ছাত্ররা যদি প্রকাশ্যতঃ ইসলাম ত্যাগ নাও করে তথাপি অন্ততঃ পক্ষে নিজ ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ই। তাদের মনে ইসলামের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাই আর অবশিষ্ট থাকে না। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস থেকে তারা স্পষ্টতই দূরে সরে যায়। ইবাদাতকে তারা খেলা মনে করতে আরম্ভ করে। ইসলামী বিধানকে খোলাখুলিভাবে লংঘন করে। শুধুমাত্র বংশগত সম্পর্ক ও সামাজিক প্রতিরোধের মুখে তাদের ইসলামের সাথে নামমাত্র সম্পর্ক থাকে। একথা সত্য যে, মিঃ আরনল্ডের অভিজ্ঞতা অনুসারে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন কোনো কোনো সময় সম্পূর্ণ বিপরীত ফলও দর্শিয়েছে। কোনো কোনো ছাত্র খৃষ্ট ধর্মের দোষ-ত্রুটি জানতে পেরে তারা আরো প্রবল বিরোধী হয়ে গেছে। কিন্তু এমন ভাগ্যবান পুণ্যাত্মার সংখ্যা খুবই কম। সাধারণভাবে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা, আমরা যা উপরে আলোচনা করেছি তাই। তাদেরকে এ ধর্মহীনতার বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া নিশ্চয়ই ইসলামের এক অতি বড় সেবার কাজ।

এ ধরনের আন্দোলনের বিপক্ষে একটি যুক্তি দর্শানো হয়ে থাকে। বলা হয়, মুসলমানরা এমনিই শিক্ষা-দীক্ষায় পেছনে পড়ে আছে এবং তাদের মধ্যে এর কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। এরপর যদি মিশনারী স্কুল-কলেজও বয়কট করা হয় তাহলে আমাদের ছেলেরা পড়বে কোথায় ? কিন্তু আমার কথা হলো,

মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ঘাটতি বর্তমান ইসলামী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পূরণ করতে পারে। বস্তুতঃ এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা তাদের প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেকগুণ উত্তম। কিন্তু সেখানে যদি ঐ ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নাও হয় তথাপি একজন খাঁটি মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে নিছক উচ্চ শিক্ষার খাতিরে ধর্মকে বিসর্জন দেয়া যেতে পারে না। মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার জন্য যদি মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া আর কোনো উপায় না থাকে, তবে তেমন উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার চেয়ে বর্জন করাই উত্তম। কেননা আমাদের শিশুদের অজ্ঞ থেকে যাওয়ার চেয়ে তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া অনেক বড় আপদ। সুতরাং মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানো প্রয়োজন। শুধু প্রচারাভিযানই যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক মুসলমান যাতে নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে তুলে আনে সে জন্যও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৫—অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি

সর্বশেষ কাজ এবং বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে জরুরী কাজ এই যে, মুসলমানদেরকে তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে হবে। আগে সরকারই ছিল ভারতীয় মুসলমানদের অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রধান সহায়। তাদের অবশ্য বাণিজ্য ও পুঁজি সংগঠনের প্রবণতা কোনোদিনই ছিল না। তাদের ছিল শুধু বিভিন্ন কারিগরি পেশার সহজাত ঝোঁক। আর এসব পেশার আর্থিক সুফল নির্ভর করতো পুরোপুরিভাবে সরকার ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের উপর। তারা এসবের কদর ও মূল্য দিতো। যখন সরকার গেল, তখন সেই সাথে তাদের সচ্ছলতা ও ধনাঢ্যতার উৎসও শুকিয়ে গেল। ফলে আজ এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা বিভিন্ন পেশার দক্ষ কারিগর ও কৃষক আছে সকলেই পুঁজিপতি হিন্দুদের গোলাম। আর যাদেরকে আল্লাহ পৈতৃক সম্পদে সম্পদশালী করেছেন তারা তাদের বিকৃত কৃষ্টি ও রুচি এবং ভ্রান্ত অপব্যয়মূলক আদত-অভ্যাসের দরুন প্রতিনিয়ত তা দেনার খাতে উড়িয়ে দিচ্ছে। এই অর্থনৈতিক দাসত্বের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কায়-কারবারের ক্ষেত্রে হিন্দুদের শক্তি এত বেড়ে গেছে যে, তা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এ দিকটায় এতখানি অগ্রসর হয়েছে যে, যখন খুশী অবরোধ চালিয়ে মুসলমানদের বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে। শহর-বন্দরে এ ব্যাপারটা কেবল অর্থনৈতিক দাসত্বের মধ্যে সীমিত আছে বটে। তবে দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলে এ জিনিসই মুসলমানদের

ধর্মচ্যুত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমুসলিম ধর্ম প্রচারকরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে অজ্ঞ গ্রাম্য মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অতএব ইসলামকে নিরাপদ করার জন্য এ রোগের চিকিৎসা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এমনকি বর্তমান অবস্থার আলোকে একথা বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, অর্থনৈতিক বিপদই ভারতবর্ষে ইসলামের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ।

জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব

মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা যেতে যারে, সেটা একটা স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়। তা নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই। তবে এটা সত্য যে, এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমাদের এ অনৈক্য ও জাতীয় দলসমূহের এ বিভিন্নতা মোটেই সমীচীন নয়। আমরা এখনো আলাদা আলাদা দল গড়ার তালে আছি। অথচ এ ক্ষেত্রে সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ শক্তি প্রয়োজন। আমরা অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট ফল আশা করছি। অথচ এ কাজে বছরের পর বছর ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম প্রয়োজন। আমরা এখনো হৈ-হল্লা করাতেই পূর্ণ স্বাদ অনুভব করি। অথচ এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রতি গভীরতর নিষ্ঠা ও সত্যিকার ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন। আমরা এখনো কেবল আগুনের মত সহসা জ্বালিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রপ্ত করেছি। অথচ এ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নেই। আমাদের এখনো অতি সামান্য উত্তাপের প্রয়োজন—যে উত্তাপ বছরের পর বছর ধরে ভেতরে ভেতরেই পাকিয়ে মণি-মুক্তা তৈরী করে দিতে পারে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কাজ করার সঠিক পদ্ধতি আয়ত্ব করতে না পারবো ততক্ষণ সমস্ত প্রস্তাবাদি নিষ্ফল। বিভিন্ন আন্দোলন যদি এখনো এ ভাবাবেগই সক্রিয় থাকে এবং আমরা যদি অন্যদের মোকাবিলা করার বদলে নিজেদের মধ্যে ঠুকাঠুকিতেই যথারীতি মশগুল থাকি, আমাদের সব কাজ যদি একতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে অনৈক্যের পথ অনুসরণ করে চলতে থাকে তাহলে আমাদের সংস্কার ও সংশোধনের সব চেষ্টা বাদ দিয়ে সকলে মিলে ইসলামের ফাতেহা পাঠ করে যার যার পসন্দসই কাজে নিয়োজিত হওয়াই উত্তম। একটি দালান তৈরী করতে যেমন ভালো মাল মশলার চেয়ে মিস্ত্রির দক্ষতার প্রয়োজন বেশী, তেমনি আমাদের ভালো ভালো প্রস্তাব ও কর্মপন্থার চেয়ে কাজ করার উত্তম যোগ্যতার প্রয়োজন বেশী। ওষুধ যত ভালোই হোক না কেন, চিকিৎসক যোগ্য না হলে সে ওষুধে রোগীর

কোনো উপকার সাধিত হয় না। অতএব আমাদের জাতির (অর্থাৎ মুসলিম উম্মতের) সুধীবৃন্দ যদি সময়ের গুরুত্ব ও নাজুকতা সঠিকভাবে অনুভব করেন তাহলে তাদের অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে সর্বপ্রথম মুসলিম জাতির ঐক্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সেই চিন্তা করতে হবে। আজ সমস্ত জাতীয় আন্দোলনগুলোতে যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা বিরাজমান তা যত শীঘ্র সম্ভব দূর করে দিতে হবে।

"ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রণাঙ্গণেও দাওয়াত ও প্রচারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর বন্দেগীর দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো অবস্থাতেই কোনো মুসলমানের পক্ষে সে কাজ বাদ দেয়া সম্ভব নয়। দাওয়াতের এ কাজ মুসলমানের জীবন ও তার ব্যক্তি সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংগ। বাস্তব জীবনের কঠোর সংগ্রামের ভেতর দিয়েও যখন আমরা এ দাওয়াত অব্যাহত রাখতে পারবো তখনই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং লক্ষ্য অর্জিত হবে। আমাদের ও খৃষ্টান মিশনারীদের মধ্যে পার্থক্য এটুকুই যে, তারা একদল পেশাদার ধর্ম প্রচারক। কিন্তু মুসলমানের প্রচার চলে কর্মব্যস্ত জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে। এ প্রচার কোথাও আলাদাভাবে বসে শুধুমাত্র ওয়ায়েজ হিসেবে করা হয় না। বরং মুসলমান যদি কোনো বাজারে কার্যরত থাকে তাহলে একদিকে সে নিজের কায়কারবার চালায়, অপরদিকে আল্লাহর দ্বীনের দিকেও মানুষকে আহ্বান জানায়। সে যেখানেই থাক এবং যে কাজই করুক —সব অবস্থাতেই সে প্রথমে আল্লাহর দ্বীনের আহ্বায়ক, অতপর অন্য কিছু।"

ঝিলাম
১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৭ইং

—মাওলানা মওদূদী

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই